মাসিক

আল-আবরার

The Monthly AL-ABRAR

মجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

রেজি. নং-১৪৫ বর্ষ-৪, সংখ্যা-০৭

আগস্ট ২০১৫ ইং, যিলকদ ১৪৩৬ হি., শ্রাবণ ১৪২২ বাং

ذوالقعده ١٤٣٦ھ اغسطس ٢٠١٥م

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুম)

প্রধান সম্পাদক

মুফতী আরশাদ রহমানী

সম্পাদক

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক

নির্বাহী সম্পাদক

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সহকারী সম্পাদক

মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি

মুহাম্মদ হাশেম

সার্কুলেশন বিষয়ে যোগাযোগ

০১১৯১৯১১২২৪

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র

প্রচার সংখ্যা : ১০,০০০ (দশ হাজার)

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা

মুফতী এনামুল হক কাসেমী
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে :............................... ৩
পবিত্র সুন্নাহ থেকে :
'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৮ ..... ৫
দরসে ফিকহ :
হজ ও উমরা : তাৎপর্য, ফজীলত ও প্রয়োজনীয় মাসায়েল. ৯
মুফতী শাহেদ রহমানী
হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ১৬
মাওয়ায়েযে ফকীহুল মিল্লাত :
আদর্শ তালেবে ইলম.................................... ১৭
"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ :
লা-মাযহাবী বন্ধুরা! দয়া করে জবাব দেবেন কি? ২২
মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক
হজের তারিখ নিয়ে বিভ্রান্তির অবকাশ নেই ২৪
মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী
মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-১৯....... ৩০
মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
নবীজি (সা.)-এর হজ : (কিছু শিক্ষণীয় বিষয়) ৩৫
মুফতী শরীফুল আজম
মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার ১৫....... ৪১
মাও. ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৪৪
মলফূজাতে আকাবের ৪৭

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৮৪০২০৯১, ০২-৮৮৪৫১৩৮
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.com
www.monthlyalabrar.wordpress.com
www.facebook.com/মাসিক-আল-আবরার

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক: ০১১৯১২৭০১৪০ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১১৯১৯১১২২৪

সম্পাদকীয়

নীতি-আদর্শ যেন চির অটুট থাকে

উপমহাদেশে মুসলিম শাসকদের আমলে তাঁদেরই তত্ত্বাবধানে ইসলামের প্রচার-প্রসার ও ইলমী খিদমাত আঞ্জামদানে হাজারো মাদরাসা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সক্রিয় ছিল। ১৮৫৭ ইং পর্যন্ত পুরো উপমহাদেশে এসব মাদরাসায় নাহু, সরফ, বালাগাত, ফিকহ, উসূলে ফিকহ, যুক্তি ও তর্কশাস্ত্র, তাসাউফ, তাফসীর এবং হাদীসের নিয়মিত দরস চলত।

১৮৫৭ সালে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর পুরো এলাকা ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة 'রাজা-বাদশাহরা যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে অপদস্থ করে'–এ কথার বিমূর্ত বাস্তবতায় পরিণত হয়। তাদের আধিপত্যের ফলে অত্র এলাকার মুসলমানগণ ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগতভাবে যে অধঃপতন ও বিপর্যয়ের শিকার হয়েছিল, তা সুদীর্ঘ এক হৃদয়বিদারী ইতিহাস। যার করুণ চিত্র 'ইন্ডিয়ান মুসলমানস' গ্রন্থসহ, 'আসবাবে বাগাওয়াত', 'রওশন মুস্তাকবিল', 'নকশে হায়াত' ইত্যাদি কিতাবে সবিস্তারে উদ্ধৃত আছে।

মুসলমানদের এহেন ভায়াবহ নাজুক পরিস্থিতিতে তৎকালীন উম্মতের রাহবর উলামায়ে কেরাম এবং মুসলিম দার্শনিকগণের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত হয়, সরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সঠিক ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির পুরোপুরি প্রতিনিধিত্ব করতে অক্ষম। বরং এর মাধ্যমে সঠিক ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের বদলে ধ্বংস হওয়ারই প্রবল আশঙ্কা।

এরূপ অবস্থা থেকে উত্তোরণ এবং মুসলমানদের শিক্ষা কার্যক্রম পুনরুদ্ধারের পন্থা কী হতে পারে–এ ব্যাপারে তৎকালীন দুটি চিন্তাধারা ও সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। কেউ কেউ মুসলমানদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় বিভিন্ন আধুনিক শিক্ষার অনুপ্রবেশের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা পাঠ্যক্রম প্রচলনের চিন্তাধারা বাস্তবায়ন করেন। উক্ত চিন্তাধারায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি'। কিন্তু এই চিন্তাধারার বিরুদ্ধে স্বয়ং উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকেই স্লোগান ওঠে। ইসলামী শিক্ষার সঠিক প্রতিনিধিত্ব করতে তারা ব্যর্থ হয়।

উলামায়ে কেরামের চিন্তাধারা ছিল, ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র উপায়–সঠিক ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসার এবং জ্ঞানী-গুণী মুত্তাকী ও রূহানী ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে হলে সরকারের আর্থিক সাহায্য ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বতন্ত্র দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। মুসলমানদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার বাস্তব চিত্র তাঁদের সামনেও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাঁরা সব কিছুর চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন ঈমান, ইসলাম এবং ইসলামী আদর্শ ও শিক্ষাকেই। আধ্যাত্মিকভাবে প্রাপ্ত এই চিন্তাধারার অগ্রপথিক হলেন হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)। আযহারুল হিন্দ দারুল উলূম দেওবন্দ হলো এই চিন্তাধারার বাস্তব রূপ।

বর্তমানে দ্বীনি শিক্ষার নামে পাবলিক মাদরাসার যতটি ধারা বিদ্যমান, সবই এ দুই চিন্তাধারার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রতিনিধিত্বকারী। শতাধিক বছরের বাস্তবতায় এ কথা প্রমাণিত সত্য হিসেবেই উদ্ভাসিত হয়েছে একমাত্র ইখলাস এবং তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দারুল উলূম দেওবন্দের চিন্তাধারা ও আদর্শের মাধ্যমে সঠিক ইসলাম দুনিয়াতে টিকে আছে এবং থাকবে। তারই বাস্তব প্রতিনিধি এ দেশের হাজারো কওমী মাদরাসা। সাধারণ মুসলমানদের অনুদানে পরিচালিত এসব দেওবন্দী মাদরাসা যেমন একদিকে সঠিক ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের গ্যারান্টি, অন্যদিকে আদর্শ মহাপুরুষ সৃষ্টির এক বাস্তব ইতিহাস।

সুতরাং কওমী মাদরাসা যত দিন তাদের এই রূহানী চিন্তাধারা ও নীতি-আদর্শের ওপর অটল-অবিচল থাকবে, তত দিন সঠিক ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের বাগডোর তাঁদের হাতেই বিদ্যমান থাকবে। তাঁরাই হবেন আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নূরানী ইলম এবং ইসলামের সঠিক প্রহরী। তাই সকলের প্রচেষ্টা থাকতে হবে এই নীতি-আদর্শ যেন চির অটুট থাকে।

দারুল উলূম দেওবন্দের সন্তানদের কাছ থেকে সুকৌশলে ঐতিহ্যবাহী এই ইলমী নেতৃত্ব ছিনিয়ে নেওয়ার অপপ্রয়াস চলেছে যুগে যুগে এবং এখনো চলছে। এ কারণেই মূলত বিভিন্ন সময় কওমী মাদরাসার পাঠ্যক্রম, পরিচালনা পদ্ধতি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্ন সুপারিশ, প্রস্তাব ও মায়াকান্না শোনা যায়। গভীর দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে দেখা যাবে কওমী মাদরাসাকে আধুনিকীকরণের এসব মায়াকান্না মূলত উল্লিখিত ব্যর্থ চিন্তাধারারই নব্য ভার্সন। এ ছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আদর্শিক এবং সাংস্কৃতিক কৌশলও এর পেছনে কাজে লাগানো হচ্ছে।

আমরা দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা যেন সকল ষড়যন্ত্র থেকে আমাদের রক্ষা করেন। আবার এ দু'আও করি, আল্লাহ প্রদত্ত এই পন্থার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যেন কেউ নিজেদের দুনিয়া ও আখেরাত বরবাদ না করেন। আমীন।

আরশাদ রহমানী
২৯/০৭/২০১৫ ইং

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (٥٩) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا (٦٠) جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا (٦١) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (٦٢) تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا (٦٣)

৫৯. অতঃপর তাদের পর এল অপদার্থ পরবর্তীরা। তারা নামায নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হলো। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে।

৬০. কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা তওবা করেছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে। সুতরাং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের ওপর কোনো জুলুম করা হবে না।

৬১. তাদের স্থায়ী বসবাস হবে যার ওয়াদা দয়াময় আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে অদৃশ্যভাবে দিয়েছেন। অবশ্যই তাঁর ওয়াদায় তারা পৌঁছবে।

৬২. তারা সেখানে সালাম ব্যতীত কোনো অসার কথাবার্তা শুনবে না এবং সেখানে সকাল-সন্ধ্যা তাদের জন্য রুযী থাকবে।

৬৩. এটা ওই জান্নাত, যার অধিকারী করব আমার বান্দাদের মধ্যে পরহেযগারদেরকে। (সূরা মারয়াম)

আয়াতে خلف লামের সাকিন যোগে এ শব্দটির অর্থ মন্দ উত্তরসূরি, মন্দ সন্তান-সন্ততি এবং লামের যবর যোগে এর অর্থ হয় উত্তম উত্তরসূরি এবং উত্তম সন্তান-সন্ততি। (মযহারী)

মুজাহিদ বলেন, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন সৎকর্ম পরায়ণ লোকদের অস্তিত্ব থাকবে না, তখন এরূপ ঘটনা ঘটবে। তখন নামাযের প্রতি কেউ ভ্রূক্ষেপ করবে না এবং প্রকাশ্যে পাপাচার অনুষ্ঠিত হবে।

নামায অসময়ে অথবা জামা'আত ছাড়া পড়া নামায নষ্ট করার শামিল এবং বড় গুনাহ :

আয়াতে 'নামায নষ্ট করা' বলে আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ, নখয়ী, কাসেম, মুজাহিদ, ইবরাহীম, উমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহ.) প্রমুখ বিশিষ্ট তাফসীরবিদের মতে, সময় চলে যাওয়ার পর নামায পড়া বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, সময়সহ নামাযের আদব ও শর্তসমূহের মধ্যে কোনোটিতে ত্রুটি করা নামায নষ্ট করার শামিল, আবার কারও কারও মতে, নামায নষ্ট করা বলে জামা'আত ছাড়া নিজ গৃহে নামায পড়া বোঝানো হয়েছে। (কুরতুবী, বাহরে মুহীত)

খলীফা হযরত উমর (রা.) সকল সরকারি কর্মচারীর কাছে এই নির্দেশনামা লিখে প্রেরণ করেছিলেন :

ان اهم امركم عندى الصلوة فمن ضيعها فهو لما سواها اضيع

আমার কাছে তোমাদের সব কাজের মধ্যে নামায সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। অতএব যে ব্যক্তি নামায নষ্ট করে, সে ধর্মের অন্যান্য বিধিবিধান আরো বেশি নষ্ট করবে। (মুয়াত্তা মালেক)

হযরত হুযায়ফা (রা.) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে নামাযের আদব ও রোকন ঠিকমতো আদায় করছে না। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কবে থেকে এভাবে নামায পড়ছ? লোকটি বলল, চল্লিশ বছর ধরে। হুযায়ফা (রা.) বললেন, তুমি একটি নামাযও পড়োনি। যদি এ ধরনের নামায পড়েই তুমি মারা যাও, তবে মনে রেখো মুহাম্মদ (সা.)-এর স্বভাবধর্মের বিপরীতে তোমার মৃত্যু হবে।

তিরমিযীতে হযরত আবু মাসউদ আনসারী সূত্রে বর্ণিত হাদীসে রাসূলে কারীম (সা.) বলেন, ওই ব্যক্তির নামায হয় না, যে নামাযে একামত করে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি রুকু ও সিজদায়, রুকু থেকে দাঁড়িয়ে অথবা দুই সিজদার মধ্যস্থলে সোজা হয়ে দাঁড়ানো অথবা সোজা হয়ে বসাকে গুরুত্ব দেয় না, তার নামায হয় না।

মোটকথা, যে ব্যক্তি ওজুতে ত্রুটি করে অথবা নামাযের রুকু-সিজদায় তড়িঘড়ি করে ফলে রুকুর পর সোজা হয়ে দাঁড়ায় না কিংবা দুই সিজদার মধ্যস্থলে সোজা হয়ে বসে না সে নামাযকে নষ্ট করে দেয়।

হযরত হাসান (রা.) নামায নষ্টকরণ ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ সম্পর্কে বলেন, লোকেরা মসজিদসমূহকে উজাড় করে দিয়েছে এবং শিল্প-বাণিজ্য ও কামনা-বাসনায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে।

ইমাম কুরতুবী এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলেন, আজ জ্ঞানী সুধীসমাজের মধ্যে এমন লোকও দেখা যায়, যারা নামাযের আদব সম্পর্কে উদাসীন হয়ে শুধু ওঠাবসা করে। এটা ছিল ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর অবস্থা। তখন এ ধরনের লোক কুত্রাপি পাওয়া যেত। আজ নামাযীদের মধ্যে এই পরিস্থিতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।

واتبعوا الشهوات . শহওয়াত তথা কুপ্রবৃত্তি বলে দুনিয়ার সেসব

আকর্ষণকে বোঝানো হয়েছে, যেগুলো মানুষকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে গাফিল করে দেয়। হযরত আলী (রা.) বলেন, বিলাসবহুল গৃহ নির্মাণ, পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণকারী যানবাহনে আরোহন এবং সাধারণ লোকদের থেকে স্বাতন্ত্র্যমূলক পোশাক আয়াতে উল্লিখিত কুপ্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। (কুরতুবী)

فسوف يلقون غيا আরবী ভাষায় غى শব্দটি رشاد এর বিপরীত। প্রত্যেক কল্যাণকর বিষয়কে رشاد এবং প্রত্যেক অনিষ্টকর বিষয়কে غى বলা হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, 'গাই' জাহান্নামের একটি গর্তের নাম। এতে সমগ্র জাহান্নামের চেয়ে অধিক নানা রকম আযাবের সমাবেশ রয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'গাই' জাহান্নামের একটি গুহার নাম। জাহান্নামও এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। আল্লাহ তা'আলা যাদের জন্য এই গুহা প্রস্তুত করেছেন তারা হচ্ছে, যে যিনাকার যিনায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, যে মদ্যপায়ী মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, যে সুদখোর সুদ গ্রহণ থেকে বিরত হয় না, যারা পিতা-মাতার অবাধ্যতা করে, যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় এবং যে নারী অপরের সন্তানকে তার স্বামীর সন্তানে পরিণত করে দেয়। (কুরতুবী)

لغو . لايسمعون فيها لغوا বলে অনর্থক ও অসার কথাবার্তাকে, গালিগালাজ এবং পীড়াদায়ক বাক্যালাপ বোঝানো হয়েছে। জান্নাতবাসীগণ এ থেকে পাক পবিত্র থাকবে। কোনোরূপ কষ্টদায়ক কথা তাদের কানে ধ্বনিত হবে না।

الا سلاما। এটা পূর্ব বাক্যের ব্যতিক্রম। উদ্দেশ্য এই যে, সেখানে যে কথা শোনা যাবে, তা শান্তি, নিরাপত্তা ও আনন্দ বৃদ্ধি করবে। পারিভাষিক সালামও এর অন্তর্ভুক্ত। জান্নাতীগণ একে অপরকে সালাম করবে এবং আল্লাহর ফেরেশতাগণ তাদের সবাইকে সালাম করবে। (কুরতুবী)

لهم رزقهم فيها بكرة وعشيا। জান্নাতে সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত এবং দিন ও রাত্রির অস্তিত্ব থাকবে না। সদাসর্বদা এক প্রকার আলো বিকীর্ণমান থাকবে। কিন্তু বিশেষ পদ্ধতিতে দিন-রাত্রি ও সকাল-সন্ধ্যার পার্থক্য সূচিত হবে। এই প্রকার সকাল-সন্ধ্যায় জান্নাতীগণ তাদের জীবনোপকরণ লাভ করবে। এ কথা সুস্পষ্ট যে জান্নাতীগণ যখন যে বস্তু কামনা করবে, তখনই কালবিলম্ব না করে তা পেশ করা হবে। যেমন এক আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে : ولهم ما يشتهون এমতাবস্থায় মানুষের অভ্যাস ও স্বভাবের ভিত্তিতে সকাল-সন্ধ্যার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ সকাল-সন্ধ্যায় আহারে অভ্যস্ত। আরবরা বলে, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যার পূর্ণ আহার্য জোগাড় করতে পারে, সে সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যশীল।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) এই আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন, এ থেকে বোঝা যায় যে মুমিনদের আহার দিনে দুবার হয়। সকাল ও সন্ধ্যায়।

কোনো তাফসীরবিদ বলেন, আয়াতে সকাল-সন্ধ্যা বলে ব্যাপক সময় বোঝানো হয়েছে। যেমন দিবা-রাত্রি ও পূর্ব-পশ্চিম শব্দগুলোও ব্যাপক অর্থে বলা হয়ে থাকে। কাজেই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে জান্নাতীদের খাহেশ অনুযায়ী তাদের খাদ্য সদাসর্বদা উপস্থিত থাকবে। (কুরতুবী)

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে আল-আবরার

নিউ রূপসী কার্পেট

সকল ধরনের কার্পেট বিক্রয় ও সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

স্বত্বাধিকারী : হাজী সাইদুল কবীর

৭৩/এ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
ফোন : ৮৬২৮৮৩৪, ৯৬৭২৩২১

বি.দ্র. মসজিদ-মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে।

কোরআন মজীদের পর সর্বাধিক পঠিত কিতাব

ফাজায়েলে আমাল নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৮

ফাজায়েলে আমালে বর্ণিত হাদীসগুলো নিয়ে এক শ্রেণীর হাদীস গবেষকদের (!) অভিযোগ হলো, হাদীসগুলো সহীহ নয়। এগুলোর ওপর আমল করা যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবতা কী? এরই অনুসন্ধানে এগিয়ে আসে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা ঢাকার উচ্চতর হাদীস বিভাগের গবেষকগণ। তাঁদের গবেষণালব্ধ আলোচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছে মাসিক আল-আবরার। আশা করি, এর দ্বারা নব্য গবেষকদের অভিযোগগুলোর অসারতা প্রমাণিত হবে। মুখোশ উন্মোচিত হবে হাদীসবিদ্বেষীদের।

হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীকের কাজটি আরম্ভ করা হয়েছে ফাজায়েলে যিকির থেকে। এখানে ফাজায়েলে যিকিরে উল্লিখিত হাদীসগুলোর নম্বর হিসেবে একটি হাদীস, এর অর্থ, তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসের অধীনে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) উর্দূ ভাষায় যে সকল হাদীসের অনুবাদ উল্লেখ করেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে (ক. খ. গ. অনুসারে) বাংলা অর্থ উল্লেখপূর্বক আরবীতে মূল হাদীসটি, হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে।

যিকিরের একশত ফায়দা : অনুচ্ছেদের হাদীসগুলো

☆ "যে ব্যক্তি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি।"

عن ابى هريرةؓ قال قال رسول الله ﷺ يقول اللهُ تعالَى :أنا عندَ ظنِّ عبدى بى ، وأنا معه إذا ذكرَنى ، فإن ذَكَرَنى فى نفسه ذكرتُه فى نفسى ، وإن ذكَرَنى فى ملأ ذكرتُه فى ملأ خيرٍ منهم ، وإن تقرَّبَ إلىَّ شبرًا تقرَّبتُ إليه ذراعًا ، وإن تقرَّبَ إلىَّ ذراعًا تقرَّبتُ إليه باعًا ، وإن أتانى يمشى أتيته هرولةً

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (হাদীসে কুদসী) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি বান্দার সাথে ওই রূপ ব্যবহার করে থাকি, যেরূপ সে আমার সাথে ধারণা রাখে। সে যখন আমাকে স্মরণ করে আমি তার সাথেই থাকি। অতএব সে যদি আমাকে অন্তরে স্মরণ করে আমিও তাকে অন্তরে স্মরণ করি। সে যদি কোনো মজলিসে আমার যিকির করে তবে আমি ওই মজলিস হতে উত্তম (অর্থাৎ নিষ্পাপ ফেরেশতাদের) মজলিসে তার আলোচনা করি। আর বান্দা যদি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। সে যদি এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দুই হাত অগ্রসর হই। সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসতে থাকে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।

(বুখারী শরীফ ২/১১০১ হা. ৭৪০৫, মুসলিম শরীফ ২/৩৪০ হা. ২৬৭৫, তিরমিযী শরীফ ২/২০১ হা. ৩৬০৩, সুনানে কুবরা লিন নাসাঈ ৪/৪১২ হা. ৭৭৩০, মুসনাদে আহমদ ২/২৫১ হা. ৭৪৪০)

হাদীসের উল্লিখিত ইবারত মুসলিম শরীফের।

হাদীসটির মান : সহীহ

☆ হাদীসে আছে, প্রতিটি জিনিসের মধ্যে সেই জিনিস হিসেবে মরিচা ও ময়লা জন্মে। যিকির তা পরিষ্কার করে দেয়।

عن عبد الله بن عمرؓ عن النبى ﷺ انه يقول ان لكل شئ صقالة وان صقالة القلوب ذكر الله۔

(শু'আবুল ঈমান বায়হাকী ১/৩৯৬ হা. ৫২২, কানযুল উম্মাল ১/৪১৮ হা. ১৭৭৭)

হাদীসটির মান : হাসান

☆ বান্দা যে সমস্ত যিকির-আযকার করে তা আরশের চতুর্দিকে বান্দার যিকির করে ঘুরতে থাকে।

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :الَّذِينَ يَذْكُرُونَ مِنْ جَلَالِ اللهِ مِنْ تَسْبِيحِهِ، وَتَحْمِيدِهِ، وَتَكْبِيرِهِ، وَتَهْلِيلِهِ، يَتَعَاطَفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ، لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، يُذَكِّرْنَ بِصَاحِبِهِنَّ، أَلَا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ لَا يَزَالَ لَهُ عِنْدَ اللهِ شَيْءٌ يُذَكِّرُ بِهِ؟

(মুসনাদে আহমদ ২/২৬৮ হা. ১৮৩৬২, ইবনে মাজাহ হা. ৩৮০৭, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১০/৩৮৭ হা. ৩০০২৮, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৫০০ হা. ১৮৪১)

হাদীসটির মান : সহীহ

☆ হাদীসে আছে, যে মজলিসে আল্লাহর যিকির হয় না, কেয়ামতের দিন তা আফসোস ও লোকসানের কারণ হবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ":مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا فِي مَجْلِسٍ فَتَفَرَّقُوا وَلَمْ يَذْكُرُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، إِلَّا كَانَ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ": مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِى مَجْلِسٍ فَتَفَرَّقُوا، وَلَمْ يَذْكُرُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَيُصَلُّوا عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا كَانَ مَجْلِسُهُمْ تِرَةً عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(মুসনাদে আহমদ ১৫/৪৭৫ হা. ৯৭৬৪, আল মুজামুল আওসাত ৪/২৮৭ হা. ৩৭৪৪, শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী] ১/৪০১ হা. ৫৩৩, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/৮০)

হাদীসটির মান : সহীহ

☆ হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি

:لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

এ দু'আ যেকোনো দিন একশত বার পড়ে, তার জন্য ১০টি গোলাম আজাদ করার সাওয়াব লেখা হয়, একশত নেকী লেখ হয়, একশত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয় এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান হতে হেফাজতে থাকে। যে ব্যক্তি এই আমল তার চেয়ে বেশি করে সে ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি তার চেয়ে উত্তম বলে গণ্য হয় না।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ " :مَنْ قَالَ :لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ، فِى يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتّٰى يُمْسِىَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ

(বুখারী ১/৪৬৫ হা. ৩২৯৩, মুসলিম ২/৩৪৪ হা. ২৬৭১, তিরমিযী ২/১৮৫ হা. ৩৪৬৮, ইবনে মাজাহ ২/২৬৯ হা. ৩৭৯৮)

হাদীসটির মান : সহীহ

☆ বহু হাদীসে এরূপ দু'আ বর্ণিত হয়েছে। যেমন– তিনি দু'আ করতেন, হে আল্লাহ! আমার গোশতে, হাড়ে মাংসপেশিতে, পশমে, চর্মে, কানে, চোখে, উপরে, নিচে, ডানে, বামে, সম্মুখে, পেছনে নূর দ্বারা পরিপূর্ণ করে দাও। এমনকি এই দু'আও করতেন, হে আল্লাহ! আমার মাথা হতে পা পর্যন্ত নূর বানিয়ে দাও।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ .... وَكَانَ يَقُولُ فِى دُعَائِهِ :اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِى قَلْبِى نُورًا، وَفِى بَصَرِى نُورًا، وَفِى سَمْعِى نُورًا، وَعَنْ يَمِينِى نُورًا، وَعَنْ يَسَارِى نُورًا، وَفَوْقِى نُورًا، وَتَحْتِى نُورًا، وَأَمَامِى نُورًا، وَخَلْفِى نُورًا، وَاجْعَلْ لِى نُورًا قَالَ كُرَيْبٌ :وَسَبْعٌ فِى التَّابُوتِ، فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ وَلَدِ الْعَبَّاسِ، فَحَدَّثَنِى بِهِنَّ، فَذَكَرَ عَصَبِى وَلَحْمِى وَدَمِى وَشَعَرِى وَبَشَرِى، وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ

(বুখারী ২/৯৩৪ হা. ৬৩১৬, মুসলিম ১/২৬১ হা. ৭৬৩, মুসাদে আহমদ ১/৩৭৩, মুজামুল কাবীর [তাবরানী] ১০/৩৩৫ হা. ১৬৪৮, মুসতাদরাকে হাকেম ৩/৬১৭ হা. ৬২৮৬, মুসনাদে আবী আওয়ানা ২/৪৭ হা. ২২৭২)

হাদীসটির মান : সহীহ

☆ হাদীসে আছে, আমি বান্দার সাথে থাকি যতক্ষণ সে আমার যিকির করতে থাকে।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " :إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ :أَنَا مَعَ عَبْدِى إِذَا هُوَ ذَكَرَنِى وَتَحَرَّكَتْ بِى شَفَتَاهُ "

(মুসনাদে আহমদ ২/৫৪০ হা. ১০৯৮২, শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী] ১/৩৯১ হা. ৫০৯, ইবনে মাজাহ হা. ৩৭৯২, বুখারী ৯/১৫৩, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৪৯৬ হা. ১৮২৪, সহীহে ইবনে হিব্বান ৩/৯৮ হা. ৮১৫)

হাদীসটির মান : সহীহ

☆ এক হাদীসে আছে, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার নিকট আরজ করলেন, আপনি আমার ওপর অনেক এহসান করেছেন। সুতরাং আমাকে এমন তরীকা বলে দিন, যাতে আপনার বেশি বেশি শোকর আদায় করতে পারি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, তুমি যত বেশি আমার যিকির করবে, তত বেশি আমার শোকর আদায় হবে।

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ نَبِىَّ اللهِ مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ :يَا رَبِّ، قَدْ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ كَثِيرًا فَدُلَّنِى أَنْ أَشْكُرَكَ كَثِيرًا قَالَ ": اذْكُرْنِى كَثِيرًا فَإِذَا ذَكَرْتَنِى كَثِيرًا فَقَدْ شَكَرْتَنِى كَثِيرًا، وَإِذَا نَسِيتَنِى فَقَدْ كَفَرْتَنِى "

(শু'আবুল ঈমান ১/৪৫৮ হা. ৭১১)

হাদীসটির মান : সহীহ

☆ আরেক হাদীসে আছে, হযরত মূসা (আ.) আরজ করলেন, হে আল্লাহ! আপনার শান মোতাবেক শোকর কিভাবে আদায় হবে? আল্লাহ তা'আলা বললেন, তোমার জবান যেন সর্বদা যিকিরের দ্বারা তরতাজা থাকে।

عَنْ، عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ " :قَالَ مُوسٰى لِرَبِّهِ :يَا رَبِّ ,مَا الشُّكْرُ الَّذِى يَنْبَغِى لَكَ؟ قَالَ :لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِى ,

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৭/৭৩ হা. ৩৪২৮৮, শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী] ১/৪৫০ হা. ৬৭৯, আযযুহদ ওয়ার রাকায়েক ১/৩৩০ হা. ৯৪২)
হাদীসটির মান : হাসান

☆ হাদীস শরীফে এসেছে, গরিব সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) একবার হুজুর সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ধনী লোকেরা বড় বড় মর্তবা হাসিল করে নেয়; তারা আমাদের মতোই নামায-রোযা আদায় করে। অথচ সম্পদের কারণে তারা হজ, ওমরাহ ও জিহাদের মাধ্যমে আমাদের চেয়ে আগে বেড়ে যায়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিস বলে দেব, যার ফলে কোনো ব্যক্তি তোমাদের মর্তবায় পৌঁছাইতে পারবে না। অবশ্য অন্য কেউ যদি এই আমলই করে তবে সে পৌঁছাইতে পারবে। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার পড়তে বললেন।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ :جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا :ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنَ الأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَا، وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا، وَيَعْتَمِرُونَ، وَيُجَاهِدُونَ، وَيَتَصَدَّقُونَ، قَالَ :أَلَا أُحَدِّثُكُمْ إِنْ أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَاخْتَلَفْنَا بَيْنَنَا، فَقَالَ بَعْضُنَا :نُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَنَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَنُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ :تَقُولُ: سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ

(বুখারী ১/২৫৩ হা. ৮৪৩, মুসলিম ৫/৯৫ হা. ১৩৪৭, মুসনাদে আহমদ ৫/৬৭ হা. ২১৫২৯)
হাদীসটির মান : সহীহ

☆ হযরত ফাতেমা (রা.) আটা পিসা ও ঘরের অন্যান্য কাজকর্মে কষ্টের কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যখন একজন খাদেম চেয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁকে শোবার সময় ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আল-হামদুলিল্লাহ ও ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়তে নির্দেশ দিয়াছিলেন। অতঃপর বলেছিলেন, এটি খাদেম হতে উত্তম।

حَدَّثَنَا عَلِىٌّ، أَنَّ فَاطِمَةَ اشْتَكَتْ مَا تَلْقَى مِنَ الرَّحَى مِمَّا تَطْحَنُ، فَبَلَغَهَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِىَ بِسَبْىٍ، فَأَتَتْهُ تَسْأَلُهُ خَادِمًا، فَلَمْ تُوَافِقْهُ، فَذَكَرَتْ لِعَائِشَةَ، فَجَاءَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ عَائِشَةُ لَهُ، فَأَتَانَا، وَقَدْ دَخَلْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ، فَقَالَ :عَلٰى مَكَانِكُمَا .حَتّٰى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلٰى صَدْرِى، فَقَالَ :أَلَا أَدُلُّكُمَا عَلٰى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ، إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا اللّٰهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَإِنَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمَا مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ

(বুখারী ১/৪৩৯ হা. ৩১১৩, মুসলিম ২/৩৫১ হা. ২৭২৭)
হাদীটির মান : সহীহ

☆ এক হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইরশাদ বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুফরিদ লোকেরা আগে বেড়ে গিয়াছে। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুফরিদ লোক কারা? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, যারা যিকিরের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। যিকির তাদের যাবতীয় বোঝাকে হালকা করে দেয়।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَبَقَ الْمُفْرِدُونَ، قَالُوا :وَمَا الْمُفْرِدُونَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ قَالَ : الْمُسْتَهْتَرُونَ فِى ذِكْرِ اللّٰهِ، يَضَعُ الذِّكْرُ عَنْهُمْ أَثْقَالَهُمْ فَيَأْتُونَ

يَوْمَ القِيَامَةِ خِفَافًا

(তিরমিযী ৫/৫৩৯ হা. ৩৫৯৬, শু'আবুল ঈমান ১/৩৯০ হা. ৫০৬, সহীহ মুসলিম ৪/২০৬২ হা. ২৬৭৬, মুসনাদে আহমদ ২/২২৩ হা. ৮৩১০)

হাদীসটির মান : সহীহ

☆ হাদীস শরীফে আছে, বান্দা যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার বলে তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে, আমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই আর আমি সবচেয়ে বড়।

أَبِى سَعِيدٍ، وَأَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ " :مَنْ قَالَ :لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّـهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، صَدَّقَهُ رَبُّـهُ، فَقَالَ :لَا إِلَـهَ إِلَّا أَنَا، وَأَنَا أَكْبَرُ، وَإِذَا قَالَ :لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ قَالَ :يَقُولُ اللَّهُ :لَا إِلَـهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِى، وَإِذَا قَالَ :لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّـهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، قَالَ اللَّهُ :لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِى لَا شَرِيكَ لِى، وَإِذَا قَالَ :لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، قَالَ اللَّهُ :لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، لِىَ الْمُلْكُ وَلِىَ الْحَمْدُ، وَإِذَا قَالَ :لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّـهُ وَلَا حَـوْلَ وَلَا قُـوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، قَالَ اللَّهُ :لَا إِلَـهَ إِلَّا أَنَا، وَلَا حَـوْلَ وَلَا قُـوَّةَ إِلَّا بِى، وَكَانَ يَقُولُ :مَـنْ قَـالَهَـا فِى مَرَضِهِ ثُمَّ مَـاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ :"هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَـنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنِ الأَغَرِّ أَبِى مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، وَأَبِى سَعِيدٍ، بِنَـحْوِ هَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ بُنْدَارٌ قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا

(তিরমিযী ২/১৮১ হা. ৩৪৩০, ইবনে মাজাহ ২/২৬৯ হা. ৩৭৯৪, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলা [নাসাঈ] ১২২ হা. ৩৫০)

হাদীসটির মান : সহীহ

☆ হাদীস শরীফে আছে, এক পাহাড় অন্য পাহাড়কে ডেকে বলে, আজ তোমার ওপর দিয়ে কোনো যিকিরকারী পথ অতিক্রম করেছে কি? যদি সে বলে, অতিক্রম করেছে তবে উক্ত পাহাড় আনন্দিত হয়।

عَـنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ :إِنَّ " الْـجَبَـلَ لَيُـنَادِى الْجَبَلَ أَىْ فُلَانُ هَلْ مَرَّ بِكَ أَحَدٌ ذَكَرَ اللهَ عَزَّ وَجَـلَّ؟ فَإِذَا قَالَ :نَـعَمُ اسْتَبْشَرَ قَالَ :عَـوْنٌ فَيَسْمَعُنَ الزُّورَ إِذَا قِيـلَ وَلَا يَسْـمَـعُـنَ الْـخَيْـرَ هُنَّ لِلْخَيْرِ أَسْمَعُ وَقَرَأَ (وَقَالُوا اتَّخَذَ الـرَّحْـمَـنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا)

(শু'আবুল ঈমান ১/৪৫৩ হা. ৬৯১, মু'জামে কাবীর [তাবরানী] ৯/১০৩ হা. ৮৫৪২, আজমা লি আবিশশায়খ ৫/১৭১৭, হিলয়াতুল আওলিয়া ৪/২৪২)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

☆ হযরত কা'ব আহবার (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি বেশি বেশি যিকির করে সে মুনাফেকী হতে মুক্ত।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ اللهِ فَقَدْ بَرِءَ مِنَ النِّفَاقِ

(আল মুজামুল আওসাত ৭/১২৪ হা. ৬৯৩১, আল মুজামুস সাগীর ২/৭৭ হা. ৯৪৯, শু'আবুল ঈমান ১/৪১৫ হা. ৫৭৬)

হাদীসটির মান : হাসান

☆ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, জমিনের খবরাখবর তোমরা জানো কি? সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বললেন, আমাদের জানা নেই। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যেকোনো পুরুষ ও মহিলা জমিনের যে অংশে যে কাজ করেছে জমিন বলে দেবে যে অমুক বক্তি অমুক দিন আমার ওপর এই কাজ করেছে (ভালো হউক বা মন্দ হউক)। এ জন্যই বিভিন্ন জায়গায় বেশি বেশি যিকিরকারীদের সাক্ষ্যদানকারীও বেশি হবে।

عَـنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ :قَـرَأَ رَسُـولُ الـلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَـوْمَـئِـذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَـارَهَـا) (الـزلزلة٤) قَـالَ :أَتَـدْرُونَ مَا أَخْبَـارُهَا؟ قَالُوا :الـلَّـهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ " :فَـإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَـدَ عَـلَـى كُـلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا أَنْ تَقُولَ : عَمِلَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا "، قَالَ :فَهَذِهِ أَخْبَارُهَا

(তিরমিযী ২/১৭৩ হা. ২৪২৯, আস সুনানুল কুবরা [নাসাঈ] ১০/৩৪২ হা. ১১৬২৯, মুসনাদে আহমদ ২/৩৭৪ হা. ৮৮৮৯, শরহুস সুন্নাহ ৫/১১৬ হা. ৪৩০৭, সহীহে ইবনে হিব্বান ১৬/৩৬০ হা. ৭৩৬০, মুসতাদরাকে হাকেম ২/২৫৬ হা. ৩০২২, শু'আবুল ঈমান ৫/৪৬৪ হা. ৭২৯৮)

হাদীসটির মান : সহীহ [হাকেম]

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

দরসে ফিক্বহ

হজ ও উমরা

তাৎপর্য, ফজীলত ও প্রয়োজনীয় মাসায়েল

মুফতী শাহেদ রহমানী

হজের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত কারো তাওফীক হলে তা অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার। তবে হজের মাসাইল ও নিয়মনীতি সম্পর্কে সাধারণ লোক তো বটেই, এমনকি অনেক জানাশোনা লোকও বিভ্রান্তির শিকার হন। সে কারণে হজের পূর্বে এবং হজে থাকাকালীন হজের বিধিবিধান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত থাকা আবশ্যক। সাধারণের পক্ষে হজসংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য কিতাব নির্বাচন করা মুশকিল। কারণ বাজারে নির্ভরযোগ্য অনেক বই যেমন পাওয়া যায়, তেমনি হজ সম্পর্কে অনির্ভরযোগ্য বইয়েরও অভাব নেই। বক্ষমান প্রবন্ধে নির্ভরযোগ্য হাদীস ও ফিকহ গ্রন্থের আলোকে হজের ফজীলত ও প্রয়োজনীয় বিধিবিধানগুলো সবিস্তারে উপস্থাপন করা হলো।

হজের ফরজিয়্যাত :

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

আর এ ঘরের হজ করা হলো মানুষের ওপর আল্লাহর প্রাপ্য, যে লোকের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার। আর যে লোক তা মানে না আল্লাহ সারা বিশ্বের কোনো কিছুরই পরোয়া করেন না। (আলে ইমরান ৯৭)

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হজ আদায় করে এবং সেখানে যাবতীয় মন্দ কাজ ও কথা থেকে বিরত থাকে সে সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানের মতো গুনাহমুক্ত হয়ে ফিরবে। (বুখারী ১৪২৪)

হজের অর্থ :

আভিধানিক অর্থ : মক্কা শরীফের ইচ্ছা করা। (আততা'রীফাত)

শরয়ী অর্থ : নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট স্থানের যিয়ারত করা। (আততা'রীফাত ১/২৬)

হজ ফরজ হওয়ার ব্যাপারে পুরো উম্মত একমত। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই।

হজের শর্তসমূহ :

১। হজ ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ :

নিম্নোল্লিখিত শর্তসমূহ পাওয়া গেলে প্রত্যেক নর-নারীর ওপর জীবনে একবার হজ ফরজ হয়। (বুখারী ১৪২৪, মুসলিম ২৩৮০)

১। মুসলমান হওয়া। অমুসলিমের ওপর হজ ফরজ নয়। (বুখারী ৩৫৬)

২। বালেগ হওয়া। নাবালেগের ওপর হজ ফরজ নয়। (বুখারী ১৬/৩১৫ বায়হাকী ১০১৩৩)

৩। আকলওয়ালা তথা বোধসম্পন্ন হওয়া। নির্বোধ পাগলের ওপর হজ ফরজ নয়। (বুখারী ১৬/৩১৫)

৪। আযাদ হওয়া, গোলামের ওপর হজ ফরজ নয়। (আলে ইমরান ৯৭, বায়হাকী ১০১৩৩)

৫। সামর্থ্যবান হওয়া।

সামর্থ্যবান হওয়ার অর্থ হলো, নিজের অনুপস্থিতিতে পরিবারের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা এবং যাতায়াত ও পাথেয়-এর মালিক হওয়া। (তিরমিযী ৭৪১) যদি নিজ খরচে যাওয়ার মতো মাহরাম না থাকে তবে নারীদের ক্ষেত্রে নিজের এবং একজন মাহরামের হজে যাওয়া-আসা ও থাকা-খাওয়ার যাবতীয় খরচ বহনে সামর্থ্যবান হতে হবে।

৬। হজের সময়ের আগমন।

২। হজ আদায় ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ :

কোনো ব্যক্তির ওপর হজ ফরজ হওয়ার পর নিজে হজ আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার জন্য যে সকল শর্ত রয়েছে তা উল্লেখ করা হলো। এ সকল শর্ত পাওয়া না গেলে নিজে হজ করা ওয়াজিব হবে না। বরং অন্য কোনো ব্যক্তি দ্বারা তৎক্ষণাৎ বদলি হজ করাতে হবে অথবা বদলি হজ করানোর জন্য অসিয়ত করতে হবে।

১। শারীরিকভাবে হজ করতে সক্ষম হওয়া। (বায়হাকী ৮৯২২)

২। হজে গমনে প্রতিবন্ধকতা না থাকা। যেমন কয়েদি বা বাধ্য ব্যক্তি। (বায়হাকী ৮৯২২)

৩। রাস্তার নিরাপত্তা থাকা। (সুনানে কুবরা ৮৯২২)

৪। নারী যুবতী হোক বা বৃদ্ধা তার সাথে স্বামী বা অন্য কোনো মাহরাম থাকা। (বুখারী ১০২৪, দারা কুতনী ২৪৬৭)

৫। মহিলা তালাক বা স্বামীর মৃত্যুর কারণে ইদ্দত অবস্থায় না হওয়া। (সূরায়ে তালাক ১)

৩। হজ সহীহ হওয়ার শর্তসমূহ :

নিম্নোল্লিখিত শর্তসমূহ পাওয়া না গেলে হজ আদায় সহীহ হবে না।

১। ইহরাম তথা হজের নিয়্যাত করা। সুতরাং ইহরাম বাঁধা ছাড়া হজ আদায় সহীহ হবে না। (বুখারী ১)

ইহরামের নিয়ম হলো, মীকাত থেকে তালবিয়া পড়ার মাধ্যমে হজের নিয়্যাত করা। পুরুষরা ইহরামের সময় সেলাই করা কাপড় খুলে সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান করবে। (বুখারী ১৭০৭)

নারীরা স্বাভাবিক কাপড় পরবে। তবে নেকাব বা অন্য কোনো কাপড় চেহারার সাথে লেগে থাকতে পারবে না।

তালবিয়া এভাবে পড়বে :

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ،لَبَّيْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ،اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ.

(বুখারী ১৪৪৮)

২। সময়। সুতরাং হজের নির্দিষ্ট সময়ের আগে বা পরে হজ আদায় সহীহ হবে না। (বাকারা ১৯৭)

মাসআলা : হজের মাস হলো ১। শাওয়াল, ২। যিলকদ ও ৩। যিলহজের প্রথম দশ দিন। সুতরাং এ সময়ের আগে হজের তাওয়াফ বা সাঈ করলে সহীহ হবে না। হজের মাসের আগে ইহরাম বাঁধা মাকরূহ। (বুখারী ৫/৪৬১)

৩। নির্দিষ্ট স্থান। অর্থাৎ আরাফার ময়দানে অবস্থান করা, তাওয়াফে যিয়ারত বায়তুল্লাহ শরীফে করা, রমী মীনাতে করা এবং পশু কুরবানী হারাম শরীফে করা।

যদি সময়মতো আরাফায় অবস্থান না করা হয় তবে হজ সহীহ হবে না। (নাসাঈ ২৯৬৬, সূরায়ে হজ ২৯)

ইহরাম বাঁধার মীকাত :

হজ বা উমরা পালনোদ্দেশ্যে রওনাকারীগণের জন্য ইহরাম বাঁধা ছাড়া যে সকল নির্ধারিত স্থান অতিক্রম করা নাজায়েয সে স্থানসমূহকে মীকাত বলা হয়। (আউনুল মাবূদ ৪/১৩৯)

দিক ভিন্নতার কারণে মীকাতও ভিন্ন ভিন্ন। যেমন– ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তানের মীকাত হলো 'ইয়ালামলাম'। মিসর, সিরিয়া এবং পশ্চিমাদের মীকাত হলো 'জুহফা'। ইরাক ইত্যাদি দেশের মীকাত হলো 'যাতে ইরক'। মদীনা শরীফের দিক থেকে আগন্তুকদের জন্য 'যুল হুলাইফা' এবং নজদবাসীর মীকাত হলো 'করন'। সুতরাং যে যেদিক থেকে আসবে মীকাতের আগে ইহরাম বেঁধে তারপর মীকাত অতিক্রম করতে হবে। ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা জায়েয নেই।

মক্কাবাসী বা হুদূদে অবস্থানকারীদের হজের মীকাত মক্কা আর উমরার মীকাত 'হিল'। যে সকল লোক 'হিল' (মীকাত এবং হুদূদে হেরমের মধ্যবর্তী স্থান)-এ অবস্থান করছে তারা হুদূদে প্রবেশের পূর্বে ইহরাম বাঁধবে। (বুখারী ১৪২৭)

হজের ফরজসমূহ :

হজের ফরজ তিনটি।

১। ইহরাম বাঁধা। (সুনানে কুবরা ৯১৯০)

২। যিলহজ মাসের ৯ (নবম) তারিখ সূর্য হেলার পর থেকে ঈদুল আযহার দিন সুবহে সাদিক পর্যন্তের যেকোনো সময় আরাফার ময়দানে অবস্থান করা। এই সময়ের মধ্যে অতি অল্প সময়ও আরাফার ময়দানে অবস্থান করলে ফরজ আদায় হয়ে যাবে। (তিরমিযী ৮১৪)

৩। আরাফায় অবস্থানের পর কাবা শরীফে সাত চক্কর লাগানো। যাকে তাওয়াফে যিয়ারত বা তাওয়াফে এফাযা বলা হয়।

হজের ওয়াজিবসমূহ :

১। সামান্য সময়ের জন্য হলেও মুযদালাফায় অবস্থান করা। এর সময় হলো যিলহজের দশ তারিখ সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। (সূরায়ে বাকারা ১৯৮, তিরমিযী ৮১৫)

২। সাফা মারওয়ায় সাত চক্কর লাগানো। যাকে সাঈ বলা হয়। চক্কর লাগানো আরম্ভ হবে সাফা থেকে আর শেষ হবে মারওয়ায়। (দারাকুতনী ২৬১৫, মুসলিম ২১৩৭)

৩। যথা সময়ে রমী করা। (শয়তানকে পাথর মারা) (মুসলিম ২২৮৬)

৪। তামাত্তু ও কেরান হজকারীগণ দমে শোকর তথা হজের কুরবানী করা।

৫। হারামে কুরবানীর দিনসমূহে মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছোট করা। (মুসলিম ২২৯৮, বুখারী ১৬১৩)

৬। মক্কাবাসী ব্যতীত অন্যরা তাওয়াফে সদর তথা তাওয়াফে 'বিদা' করা। (মুসলিম ২৩৫০)

উল্লেখ্য, এই ছয়টি হলো হজের ওয়াজিব। হজের আমলসমূহে আরো কিছু ওয়াজিব রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ।

১। ১২ যিলহজ সূর্যাস্তের পূর্বে তাওয়াফে যিয়ারাত (ফরজ তাওয়াফ) সম্পন্ন করা। (মুসলিম ২৩০৭, সুনানে কুবরা ৯৯২৮)

২। সূর্য হেলার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা। (মুসলিম)

৩। তাওয়াফ অবস্থায় (হাদসে আকবার ও আসগার তথা ওজু বা গোসল ফরজ হয় এমন অবস্থা থেকে) পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন থাকা। (নাসায়ী ২৮৭৩, মুসলিম ২১৭৩)

৪। প্রত্যেক তাওয়াফের পর দুই রাক'আত নামায আদায় করা। (বুখারী ১৫১১)

৫। কেরান ও তামাত্তু হজকারী তারতীব বজায় রেখে তিনটি কাজ করা (ক) রমী (খ) কুরবানী এবং (গ) হলক। (সহীহ

মুসলিম ১৯৮, উমদাতুল কারী ১০/৫৮)
৬। সতর ঢাকা। (বুখারী)
৭। তাওয়াফের সূচনা হজরে আসওয়াদ থেকে করা। (দারাকুতনী ২/২৮৯, মুসলিম ৮/১৭৪, মারাকিল ফালাহ ৭২৯)

হজের সুন্নাতসমূহ :

১। ইহরাম বাঁধার সময় গোসল বা ওজু করা এবং শরীরে খোশবু মাখা। (তিরমিযী ৭৬০, মুসলিম ৮/১০১)
২। নতুন বা পরিষ্কার চাদর পরা। সাদা হওয়া উত্তম (মুসানাদে আহমদ ৪৮৯৯, তিরমিযী ৯১৫,২৭২৩)
৩। ইহরাম বাঁধার পূর্বে দুই রাক'আত নামায আদায় করা। (মুসলিম ২০৩১)
৪। বেশি বেশি তালবিয়া পড়া। (মুসলিম ২২৪৬)
৫। মক্কাবাসী ব্যতীত অন্যরা হজে ইফরাদ বা কিরান করা কালীন তাওয়াফে কুদুম করা। (মুসলিম ২১৩৯)
৬। মক্কায় থাকাকালীন বেশি বেশি তাওয়াফ করা। (তিরমিযী ৭৯৪)
৭। 'ইযতিবা' করা। অর্থাৎ তাওয়াফ আরম্ভ করার আগে চাদরের একদিককে নিজের ডান বাহুর নিচে রাখা এবং অপর দিককে বাম কাঁধের ওপর পেঁচিয়ে দেওয়া। (তিরমিযী ৭৮৭)
৮। তাওয়াফের সময় 'রমল' করা। রমলের পদ্ধতি হলো তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করের সময় ঘনঘন কদম ফেলা এবং উভয় কাঁধ হেলাতে হেলাতে চলা। (বুখারী ১৫০১) (উল্লেখ্য, 'রমল' ও 'ইজতিবা' ওই তওয়াফে সুন্নাত যে তাওয়াফের পরে সাঈ করা হয়)
৯। সাঈ করার সময় উভয় মীলাইনে আখযারাইনের (সবুজ বাতি) মধ্যখানে জোরে হাঁটা (পুরুষদের জন্য)। (মুসলিম ২১৩৭)
১০। তাওয়াফের প্রত্যেক চক্করে হাজরে আসওয়াদে চুমু দেওয়া। (চুমু দেওয়া সম্ভব না হলে হাজরে আসওয়াদের দিকে হাত উঁচিয়ে ইশারা করে হাতে চুমু দেওয়া)। (আবু দাউদ ১৬০০, বুখারী ১৫০৬, ১৫০৭)
১১। কুরবানীর দিনসমূহে মীনাতে রাত যাপন করা। (আবু দাউদ ১৬৮৩)

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ :

নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ মুহরিমের জন্য নাজায়েয। এ সকল কাজ থেকে মুহরিমদের বেঁচে থাকা অত্যাবশ্যক, যাতে হজ নষ্ট বা ত্রুটিপূর্ণ না হয়।
১। ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস বা এরূপ কাজে আকৃষ্টকারী কোনো কাজ না করা। (সূরা বাকারা ১৯৮, রূহুল মাআনী ২/১৬৪)
২। কোনো প্রকার হারাম কাজ না করা। (গ্রাগুক্ত)
৩। গাল-মন্দ ও ঝগড়া থেকে বিরত থাকা। (গ্রাগুক্ত)
৪। খোশবু ব্যবহার না করা। যেমন আতর, গোলাপ, জাফরান ইত্যাদি। (বুখারী ১৭০৭, ১৭০৮, মুসলিম ২০১৮)
৫। পুরুষরা সেলাইকৃত বস্ত্র না পরা। যেমন–কোর্তা, পায়জামা, পাঞ্জাবি, জুব্বা, মোজা ইত্যাদি। সেরূপ মাথা বা মুখ ঢেকে রাখার কাপড়চোপড়। (প্রাগুক্ত)
৬। নখ, মাথার চুল, দাড়ি এবং নাভির নিচের কেশ ইত্যাদি কর্তন না করা। (বাকারা ১৯৬, আলফিকহুল ইসলামী ৩/৬০৩)
৭। চুল বা (কেশ এবং) শরীরের কোনো অঙ্গে ঘ্রাণযুক্ত তেল না লাগানো। (বুখারী ৪৯১৮, বাদায়ে ৫/১৩০)
৮। হুদুদে হারামে গাছ বা ঘাস ইত্যাদি কর্তন না করা। হুদুদে হারামে এই কাজ সর্বাবস্থায় হারাম। (বুখারী ১৪৮৪)
৯। স্থলের কোনো বন্য প্রাণী শিকার না করা। উক্ত প্রাণী খাওয়া জায়েয হোক বা নাজায়েয। (বাকারা ১৯৭, মায়েদা ৯৬, তিরমিযী ৭৭৫, বুখারী ১৭০৭ ইত্যাদি)

উমরা :

হজ আদায় ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ যার মাঝে পাওয়া যাবে তার জন্য পুরো জীবনে একবার উমরা করা সুন্নাতে মুআক্কাদা। (মুসনাদে আহমদ ১৪৪৩)
পুরো বছরই উমরা করা যায়। তবে আরাফার দিন, কুরবানীর দিন এবং তাশরীকের দিনসমূহে উমরার ইহরাম বাঁধা মাকরূহ। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৩/৪৮৫)
উমরার কাজ হলো চারটি : দুটি ফরজ, দুটি ওয়াজিব।

উমরার ফরজ দুটি :

১। ইহরাম বাঁধা। (বুখারী ১)
২। তাওয়াফ করা। (বুখারী ১৪৬৬)

উমরার ওয়াজিব দুটি :

১। সাফা মারওয়ার সাঈ করা। (প্রাগুক্ত)
২। মাথা মুণ্ডানো বা চুল কর্তন করে ছোট করা। (বুখারী ১৬১৩)

উমরা আদায়ের পদ্ধতি :

মক্কার নাগরিক বা অবস্থানরত লোক হিল (হারামের সীমানার বাইরে মীকাতের ভেতরের স্থান) থেকে আর মক্কার বাইরে থেকে আগন্তুক ব্যক্তি মীকাত থেকে উমরার নিয়্যাতে ইহরাম বেঁধে বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ, সাফা-মারওয়া সাঈ করবে এবং মাথা মুণ্ডাবে বা ছোট করবে। (বুখারী ১৪৫৯, মুসলিম ২০৩০)

হজ আদায়ের সঠিক পদ্ধতি :

হজ তিন প্রকার–তামাত্তু, কিরান ও ইফরাদ। এখানে প্রথমে হজে তামাত্তুর আলোচনা। এরপর বাকি দুই প্রকারের আলোচনা করা হবে।

হজে তামাত্তু

হজের মাসসমূহে (শাওয়াল, জিলকদ, যিলহজ) উমরার নিয়্যাতে ইহরাম করে, উমরা পালন করে হালাল হওয়ার পর হজের নিয়্যাত করে নতুন এহরামে হজ পালন করাকে হজে তামাত্তু বলে।

১. উমরার ইহরাম (ফরজ)

প্রথমেই জেনে নিন আপনার গন্তব্য ঢাকা থেকে মক্কা শরীফ? নাকি মদীনা শরীফ? যদি মদীনা শরীফ হয়, তাহলে এখন ইহরাম বাঁধা নয়; যখন মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফ যাবেন, তখন ইহরাম বাঁধতে হবে। বেশির ভাগ হজযাত্রী আগে মক্কায় যান। এ ক্ষেত্রে ঢাকা থেকে বিমানে ওঠার আগে ইহরাম বাঁধা ভালো। কারণ, জেদ্দা পৌঁছার আগেই 'ইয়ালামলাম' মীকাত বা ইহরাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থানটি পড়ে। বিমানে যদিও ইহরাম বাঁধার কথা বলা হয়, কিন্তু ওই সময় অনেকে ঘুমিয়ে থাকেন; আর বিমানে পোশাক পরিবর্তন করাটাও দৃষ্টিকটু।

মনে রাখবেন, ইহরামের কাপড় পরিধান করলেই ইহরাম বাঁধা হয়ে যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত নিয়্যাত করে 'তালবিয়া' তথা "লাব্বাইক....." পড়া না হয়। তাই ইহরামের কাপড় পরিধানের পর সতর্কতামূলক বিমান ছাড়ার পর নিয়্যাত করে তালবিয়া আরম্ভ করা ভালো। বিনা ইহরামে মীকাত পার হলে এ জন্য দম দিতে হবে। তদুপরি গুনাহ হবে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সেরে গোসল বা ওজু করে নিন।

মীকাত অতিক্রমের আগেই সেলাইবিহীন একটি সাদা কাপড় পরিধান করুন, আরেকটি গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ইহরামের নিয়্যাতে দুই রাক'আত নামায পড়ে নিন।

শুধু উমরার নিয়্যাত করে এক বা তিনবার তালবিয়া পড়ে নিন।

ইহরামের নিয়্যাতের সময় বলুন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِیْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِیْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّی

এপর পর তালবিয়া এভাবে পড়ুন :

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ.

ঢাকা বিমানবন্দর

উড্ডয়নের সঠিক সময় অনুযায়ী বিমানবন্দরে পৌঁছান। আপনার নাম-ঠিকানা লেখা ব্যাগ বা স্যুটকেসে কোনো পচনশীল খাবার রাখবেন না। বিমানবন্দরে লাগেজে যে মাল দেবেন, তা ঠিকমতো বাঁধা হয়েছে কি না, দেখে নেবেন।

বাংলাদেশ সরকারের দেওয়া পরিচয়পত্র, পিলগ্রিম পাস, বিমানের টিকিট, টিকা দেওয়ার কার্ড, অন্য কাগজপত্র, টাকা, বিমানে পড়ার জন্য ধর্মীয় বই ইত্যাদি গলায় ঝোলানোর ব্যাগে সযত্নে রাখুন।

সময়মতো বিমানে উঠে নির্ধারিত আসনে বসুন।

জেদ্দা বিমানবন্দর :

মোয়াল্লিমের গাড়ি আপনাকে জেদ্দা থেকে মক্কায় যে বাড়িতে থাকবেন, সেখানে নামিয়ে দেবে। মোয়াল্লিমের নম্বর (আরবীতে লেখা) কবজি বেল্ট দেওয়া হবে, তা হাতে পরে নেবেন। পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের দেওয়া পরিচয়পত্র (যাতে পিলগ্রিম পাস নম্বর, নাম, ট্রাভেল এজেন্টের নাম ইত্যাদি থাকবে) গলায় ঝোলাবেন।

যানবাহনের ওঠানামার সময় ও চলার পথে বেশি বেশি তালবিয়া পড়ুন

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ.

মক্কায় পৌঁছে :

মক্কায় পৌঁছে আপনার থাকার জায়গায় মালপত্র রেখে ক্লান্ত হলে বিশ্রাম করুন। আর যদি নামাযের ওয়াক্ত হয়, নামায আদায় করুন। বিশ্রাম শেষে উমরার নিয়্যাত করে থাকলে উমরা পালন করুন।

মসজিদুল হারামে (কা'বা শরীফ) অনেকগুলো প্রবেশপথ আছে; সবকটি দেখতে একই রকম। কিন্তু প্রতিটি প্রবেশপথে আরবী ও ইংরেজিতে ১, ২, ৩ নম্বর ও প্রবেশপথের নাম আছে, যেমন–বাদশা আবদুল আজিজ প্রবেশপথ। আপনি আগে থেকে ঠিক করবেন, কোন প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকবেন বা বের হবেন। আপনার সফরসঙ্গীকেও স্থান চিনিয়ে দিন। তিনি যদি হারিয়ে যান, তাহলে নির্দিষ্ট নম্বরের গেটের সামনে থাকবেন। এতে ভেতরে ভিড়ে হারিয়ে গেলেও নির্দিষ্ট স্থানে এসে সঙ্গীকে খুঁজে পাবেন।

কা'বা শরীফে স্যান্ডেল রাখার ক্ষেত্রে খুব সতর্ক থাকবেন, নির্দিষ্ট স্থান তথা জুতা রাখার জায়গায় রাখুন। এখানে-সেখানে জুতা রাখলে পরে আর খুঁজে পাবেন না। প্রতিটি জুতা রাখার র‍্যাকেও নম্বর দেওয়া আছে। এই নম্বর স্মরণ রাখুন।

উমরার নিয়মকানুন আগে জেনে নেবেন, যেমন–সাত চক্করে তাওয়াফ করা, জমজমের পানি পান করা, নামায আদায় করা, সাঈ করা (সাফা-মারওয়া পাহাড়ে দৌড়ানো-যদিও মসৃণ পথ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত) মাথা মুণ্ডানো অথবা চুল ছোট করা–এসব কাজ ধারাবাহিকভাবে করা। ওয়াক্তীয়া নামাযের সময় হয়ে গেলে ওই সময় নামায পড়ে আবার বাকিটুকু শেষ করা।

কা'বা শরীফ :

হারাম শরীফে প্রবেশ করার সময় এই দু'আ পড়া–

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

পড়বেন। মসজিদুল হারামে পুরুষ কোনো নারীর পাশে অথবা তাঁর সরাসরি পেছনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবেন না।

কোনো দরজার সামনে নামায পড়া ঠিক নয়, এতে পথচারীর কষ্ট হয়।

হাজরে আসওয়াদে চুমু দেওয়া সুন্নাত।

তবে ভিড়ের কারণে না পারলে দূর থেকে চুমুর ইশারা করলেই চলবে। ভিড়ে অন্যকে কষ্ট দেওয়া যাবে না।

২. উমরার তাওয়াফ (ফরজ)

ওজুর সঙ্গে 'ইজতিবা'সহ তাওয়াফ করুন। ইহরামের চাদরকে ডান বগলের নিচের দিক থেকে পেঁচিয়ে এনে বাঁ কাঁধের ওপর রাখাকে 'ইজতিবা' বলে।

হাজরে আসওয়াদকে সামনে রেখে তার বরাবর ডান পাশে দাঁড়ান (২০০৬ সাল থেকে মেঝেতে সাদা মার্বেল পাথর আর ডান পাশে সবুজ বাতি)। তারপর দাঁড়িয়ে তাওয়াফের নিয়্যাত করুন। তারপর ডানে গিয়ে এমনভাবে দাঁড়াবেন, যেন হাজরে আসওয়াদ পুরোপুরি আপনার সামনে থাকে। এরপর দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলে

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ اَكْبَرُ
لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللـهُ وَاللـهُ اَكْبَـرُ اَللّٰهُمَّ تَصْدِيْقاً بِكِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ

পড়ুন। পরে হাত ছেড়ে দিন এবং হাজরে আসওয়াদের দিকে হাত দিয়ে ইশারা করে হাতের তালুতে চুমু খেয়ে ডান দিকে চলতে থাকুন, যাতে পবিত্র কা'বাঘর পূর্ণ বাঁয়ে থাকে। পুরুষের জন্য প্রথম তিন চক্করে 'রমল' করা সুন্নাত। 'রমল' অর্থ বীরের মতো বুক ফুলিয়ে কাঁধ দুলিয়ে ঘন ঘন কদম ফেলে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলা।

রুকনে ইয়ামানিকে সম্ভব হলে শুধু হাতে স্পর্শ করুন। রুকনে ইয়ামানিতে এলে এই দু'আ পাঠ করুন। তবে চুমু খাওয়া থেকে বিরত থাকুন।

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অতঃপর হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত এসে চক্কর পুরো করুন।

পুনরায় হাজরে আসওয়াদ বরাবর দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে ইশারা করে হাতের তালুতে চুমু খেয়ে দ্বিতীয় চক্কর শুরু করুন। এভাবে সাত চক্করে তাওয়াফ শেষ করুন।

হাতে সাত দানার তাসবীহ অথবা গণনাযন্ত্র রাখতে পারেন। তাহলে সাত চক্কর ভুল হবে না।

৩. তাওয়াফের দুই রাক'আত নামায (ওয়াজিব)

মাকামে ইবরাহীমের পেছনে বা হারামের যেকোনো স্থানে তাওয়াফের নিয়্যাতে (মাকরূহ সময় ছাড়া) দুই রাক'আত নামায পড়ে দু'আ করুন। মনে রাখবেন, এটা দু'আ কবুলের সময়।

৪. উমরার সাঈ (ওয়াজিব)

সাফা পাহাড়ের কিছুটা ওপরে উঠে (এখন আর পাহাড় নেই, মেঝেতে মার্বেল পাথর, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত) কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে সাঈ-এর নিয়্যাত করে, দু'আর মতো করে হাত তুলে তিনবার তাকবির বলে দু'আ করুন। তারপর মারওয়ার দিকে রওনা হয়ে দুই সবুজ দাগের মধ্যে (এটা সেই জায়গা, যেখানে হজরত হাজেরা (রা.) পানির জন্য দৌড়েছিলেন) একটু দ্রুত পথ চলে মারওয়ায় পৌঁছলে এক চক্কর পূর্ণ হলো। মারওয়া পাহাড়ে উঠে কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে দু'আর মতো করে হাত তুলে তাকবীর পড়ুন এবং আগের মতো চলে সেখান থেকে সাফায় পৌঁছলে দ্বিতীয় চক্কর পূর্ণ হলো এভাবে সপ্তম চক্করে মারওয়ায় গিয়ে সাঈ শেষ করে দু'আ করুন।

সাঈ শেষে দুই রাক'আত নফল নামায পড়ুন। (মুস্তাহাব)

৫. হলক করা (ওয়াজিব)

পুরুষ হলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শের অনুসরণে সম্পূর্ণ মাথা মুণ্ডন করবেন। তবে মাথার চুল ছাঁটতেও পারেন। মহিলা হলে মাথার চুল এক ইঞ্চি পরিমাণ কাটবেন।

এ পর্যন্ত উমরার কাজ শেষ।

হজের ইহরাম না বাঁধা পর্যন্ত ইহরামের আগের মতো সব কাজ করতে পারবেন।

৬. হজের ইহরাম (ফরজ)

হারাম শরীফ বা বাসা থেকে আগের নিয়মে শুধু হজের নিয়তে ইহরাম বেঁধে ৮ যিলহজ জোহরের আগেই মীনায় পৌঁছে যাবেন। (যদি সম্ভব হয়)

নিয়্যাত করার সময় বলবেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُالْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّى

৭. মীনায় অবস্থান (সুন্নাত)

৮ যিলহজ জোহর থেকে ৯ জিলহজ ফজরসহ মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামায মীনায় আদায় করুন এবং এ সময়ে মীনায় অবস্থান করুন।

৮. আরাফার ময়দানে অবস্থান (ফরজ)

আরাফার ময়দানে অবস্থান হজের অন্যতম ফরজ।

৯ যিলহজ দুপুরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফার ময়দানে অবস্থান করুন। এদিন নিজ তাঁবুতে জোহর ও আসরের নামায স্ব স্ব সময়ে আলাদাভাবে আদায় করুন। মুকিম হলে চার রাক'আত পূর্ণ পড়ুন। মসজিদে নামিরায় উভয় নামায জামা'আতে পড়লে একসঙ্গে আদায় করতে পারেন, যদি ইমাম মুসাফির হন। আর মসজিদে নামিরা যদি আপনার তাঁবু থেকে দূরে থাকে, তাহলে নিজ স্থানে অবস্থান করবেন। মাগরিবের নামায না পড়ে মুযদালিফার দিকে রওনা হোন।

৯. মুযদালিফায় অবস্থান (ওয়াজিব) রাত্রি যাপন (সুন্নাত)

আরাফায় সূর্যাস্তের পর মুযদালিফায় গিয়ে এশার সময়ে মাগরিব ও এশা এক আজান ও এক ইকামতে একসঙ্গে আদায় করুন। (ওয়াজিব)

এখানেই রাত যাপন করুন (এটি সুন্নাত) এবং ১০ যিলহজ ফজরের পর সূর্যোদয়ের আগে কিছু সময় মুযদালিফায় অবশ্যই অবস্থান করুন (এটি ওয়াজিব)। তবে দুর্বল (অপারগ) ও নারীদের বেলায় এটা অপরিহার্য নয়। রাতে ছোট ছোট ছোলার দানার মতো ৭০টি কঙ্কর সংগ্রহ করুন। মুযদালিফায় কঙ্কর খুব সহজেই পেয়ে যাবেন।

১০. কঙ্কর মারা (প্রথম দিন)

১০ যিলহজ সুবহে সাদিক থেকে ১১ যিলহজ সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত শুধু বড় জামারাকে (বড় শয়তান) সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করুন (ওয়াজিব)। যদি এই সময়ের মধ্যে কঙ্কর মারা না হয় তবে দম দিতে হবে।

১১. কুরবানী করা (ওয়াজিব)

১০ যিলহজ কঙ্কর মারার পরই কেবল দমে শোকর বা দমে তামাত্তু যাকে হজের কুরবানী বলা হয় নিশ্চিত পন্থায় আদায় করুন।

কুরবানীর পরেই কেবল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শের অনুসরণে মাথা হলক করুন (ওয়াজিব)। তবে চুল ছোটও করতে পারেন।

খেয়াল রাখবেন : কঙ্কর মারা, কুরবানী করা ও চুল কাটার মধ্যে ধারাবাহিকতা জরুরি।

১২. তাওয়াফে যিয়ারত (ফরজ)

১২ যিলহজ সূর্যাস্তের আগেই তাওয়াফে যিয়ারত করে নিতে হবে। তা না হলে ১২ যিলহজের পরে তাওয়াফটি করে দম দিতে হবে। তবে নারীরা প্রাকৃতিক কারণে করতে না পারলে পবিত্র হওয়ার পরে করবেন। এতে দম দিতে হবে না। উল্লেখ্য, তাওয়াফে যিয়ারতের সাথে সাঈ করাও ওয়াজিব। তবে আরাফার পূর্বে কোনো নফল তাওয়াফের সাথে সাঈ করে থাকলে তাওয়াফে যিয়ারতের পরে সাঈ করতে হবে না।

১৩. কঙ্কর মারা (ওয়াজিব)

১১, ১২ তারিখে সূর্য হেলার পর থেকে পরদিন সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত ১ম, ২য়, ও ৩য় জামরায় ৭টি করে ২১টি কঙ্কর প্রতিদিন নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। সূর্য হেলার পূর্বে নিক্ষেপ করলে আদায় হবে না, বরং সূর্য হেলার পর পুনরায় নিক্ষেপ করতে হবে। অন্যথায় 'দম' দিতে হবে।

১৩ তারিখ সূর্য হেলার পর কঙ্কর নিক্ষেপকরত মীনা ত্যাগ করা সুন্নাত। তবে কেউ যদি ১২ তারিখে চলে আসতে চায় তাহলে ওই দিন সূর্য হেলার পর থেকে পরদিন সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত যেকোনো সময় পাথর মেরে চলে আসতে পারবে। যদি কেউ ১৩ যিলহজ সুবহে সাদিকের পর মীনায় অবস্থান করে তাহলে তার জন্য ১৩ তারিখও রমী করা ওয়াজিব। অন্যথায় দম দিতে হবে।

১৪. মীনা ত্যাগ

১৩ যিলহজ মীনায় না থাকতে চাইলে ১২ যিলহজ সন্ধ্যার আগে অথবা সন্ধ্যার পর ভোর হওয়ার আগে মীনা ত্যাগ করুন। সূর্যাস্তের আগে মীনা ত্যাগ করতেই হবে–এটা ঠিক নয়। তবে সূর্যাস্তের আগে মীনা ত্যাগ করা উত্তম।

১৫. বিদায়ী তাওয়াফ (ওয়াজিব)

বাংলাদেশ থেকে আগত হজযাত্রীদের হজ শেষে বিদায়ী তাওয়াফ করতে হয় (ওয়াজিব)। তবে হজ শেষে যেকোনো নফল তাওয়াফই বিদায়ী তাওয়াফে পরিণত হয়ে যায়।

নারীদের মাসিকের কারণে বিদায়ী তাওয়াফ করতে না পারলে কোনো ক্ষতি নেই; দম দিতে হয় না।

১৬. মীনায় অবস্থানরত দিনগুলোতে (১০, ১১ যিলহজ) মীনাতেই রাত যাপন করুন। যদি ১৩ তারিখ রমি (কঙ্কর মারা) শেষ করে ফিরতে চান তবে ১২ তারিখ রাত যাপন করুন (সুন্নাত)।

হজে কিরান :

হজের দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে হজে কিরান। কিরান শব্দের আভিধানিক অর্থ : দুই বস্তুকে একত্রিত করা।

শরীয়তে হজে কিরান বলা হয় মীকাত থেকে হজ এবং উমরা উভয়টার একসাথে এহরাম বাঁধা।

উত্তম হজ হলো হজে কিরান তারপর তামাত্তু তারপর ইফরাদ। (বুখারী ১৪৫৪, ১৪৬১, ১৪৬৬, ১৪৬০ সূরা বাকারা ১৯৬)

হজে কিরানের নিয়্যাতকারী এরূপ বলবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فَيَسِّرْهُمَالِىْ وَتَقَبَّلْهُمامِنِّىْ

অর্থ : আল্লাহ! আমি হজ এবং উমরার নিয়্যাত করেছি, উভয়টিকে আমার জন্য সহজ করে দাও এবং উভয়টি কবুল করো। (মুসলিম ২১৯৫)

হজে কিরান আদায়ের পদ্ধতি

১. ইহরাম বাঁধা (ফরজ)

মীকাত অতিক্রমের আগে একই নিয়মে ইহরাম করার কাজ সমাপ্ত করুন। তবে হজ ও উমরা উভয়ের নিয়্যাত একসঙ্গে করে তালবিয়া পড়ুন।

২. উমরার তাওয়াফ (পূর্বে বর্ণিত) নিয়মে আদায় করুন (ওয়াজিব)।

৩. উমরার সাঈ করুন, তবে এরপর মাথা মুণ্ডাবেন না বা চুল ছাঁটবেন না; বরং ইহরামের সব বিধিবিধান মেনে চলুন (ওয়াজিব)।

৪. তাওয়াফে কুদুম করুন (সুন্নাত)।

৫. আট যিলহজ জোহর থেকে ৯ যিলহজ ফজর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায মীনাতে পড়ুন। এ সময়ে মীনাতে অবস্থান করুন (সুন্নাত)।

৬. আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করুন (ফরজ)।

৭. ৯ যিলহজ সূর্যাস্তের পর থেকে মুযদালিফায় অবস্থান এবং মাগরিব ও এশা একসঙ্গে এশার সময়ে আদায় করুন (ওয়াজিব)। তবে ১০ যিলহজ ফজরের পর কিছু সময় অবস্থান করুন (ওয়াজিব)।

৮. উপরে বর্ণিত নিয়ম ও সময় অনুসারে ১০ যিলহজ কঙ্কর নিক্ষেপ করুন (ওয়াজিব)।

৯. দমে কেরান তথা হজের কুরবানী করুন (ওয়াজিব)।
১০. মাথার চুল মুণ্ডন করে নিন (ওয়াজিব)। তবে চুল ছেঁটেও নিতে পারেন।
১১. তাওয়াফে যিয়ারত করুন (ফরজ) এবং সাঈ করে নিন, যদি তাওয়াফে কুদুমের পরে না করে থাকেন।
১২. ১১, ১২ যিলহজ কঙ্কর নিক্ষেপ করুন (ওয়াজিব)। ১৩ যিলহজ কঙ্কর মারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শ।
১৩. মীনায় থাকাকালীন মীনাতেই রাত যাপন করুন (সুন্নাত)।
১৪. মীকাতের বাইরে থেকে আগত হাজিরা বিদায়ী তাওয়াফ করুন (ওয়াজিব)।

হজে ইফরাদ :

হজের তৃতীয় প্রকার হজে ইফরাদ। শুধু হজ পালনের উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধে হজ সম্পাদনকে হজে ইফরাদ বলে।

ইফরাদ হজ আদায়ের পদ্ধতি :

১. শুধু হজের নিয়্যাতে ইহরাম বাঁধুন (ফরজ)। এরূপ বলুন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِیْدُالْحَجَّ فَیَسِّرْهُ لِیْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّی

২. মক্কা শরীফ পৌঁছে তাওয়াফে কুদুম করুন (সুন্নাত)।
উল্লেখ্য, তাওয়াফে কুদুমের পর সাঈ করলে তাওয়াফে যিয়ারতের পর সাঈ করার প্রয়োজন নেই।
৩. মীনায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও রাত যাপন করুন (সুন্নাত)।
৪. আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করুন (ফরজ)।
৫. মুযদালিফায় রাত যাপন করুন (সুন্নাত)। তবে ১০ যিলহজ ফজরের পর কিছু সময় অবস্থান ওয়াজিব।
৬. ১০ যিলহজে জামারাতে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করুন (ওয়াজিব)।
৭. যেহেতু এ হজে দমে শোকর ওয়াজিব নয়, তাই কঙ্কর নিক্ষেপের পর মাথা হলক করে নিন; তবে চুল ছেঁটেও নিতে পারেন (ওয়াজিব)।
৮. তাওয়াফে যিয়ারত করুন (ফরজ) যদি তাওয়াফে কুদুমের পর সাঈ করে থাকেন, তাহলে সাঈ করার প্রয়োজন নেই। (ওয়াজিব)।
১০. ১১-১২ জিলহজ আগে বর্ণিত নিয়ম ও সময়ে কঙ্কর নিক্ষেপ করুন (ওয়াজিব)।
১১. বদলি হজকারী ইফরাদ হজ করবেন।

ইহরাম, অন্যান্য পরামর্শ

ইহরাম সম্পর্কে জরুরি বিষয় :

যাঁরা সরাসরি বাংলাদেশ থেকে মক্কা শরীফ যাবেন, তাঁরা বাড়িতে, হাজীক্যাম্পে বা বিমানে ইহরাম করে নেবেন। বাড়িতে বা হাজীক্যাম্পে ইহরাম করে নেওয়া সহজ। ইহরাম ছাড়া যেন মীকাত অতিক্রম না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।
যাঁরা মদিনা শরীফ যাবেন, তাঁরা মদিনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফ যাওয়ার সময় ইহরাম করবেন। কোনো নারীর প্রাকৃতিক কারণে অপবিত্র অবস্থায় ইহরামের প্রয়োজন হলে ওজু-গোসল করে নামায ব্যতীত লাব্বাইক পড়ে ইহরাম করে নেবেন। তাওয়াফ ছাড়া হজ, উমরার সমস্ত কাজ নির্ধারিত নিয়মে আদায় করবেন।

তাওয়াফ ও সাঈ করার সময় বিশেষভাবে লক্ষণীয় :

তাওয়াফের সময় ওজু থাকা জরুরি। তবে সাঈ করার সময় ওজু না থাকলেও সাঈ সম্পন্ন হয়ে যাবে।
হাজরে আসওয়াদে চুমু দেওয়া একটি সুন্নাত। তা আদায় করতে গিয়ে লোকজনকে ধাক্কাধাক্কির মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া বড় গুনাহ। তাই তাওয়াফকালে বেশি ভিড় দেখলে ইশারায় চুমু দেবেন।
সাঈ করার সময় সাফা থেকে মারওয়া কিংবা মারওয়া থেকে সাফা প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন চক্কর। এভাবে সাতটি চক্কর সম্পূর্ণ হলে একটি সাঈ পূর্ণ হবে।

মাসআলা : কুরবানীর দিন জামরায়ে উকবায় পাথর নিক্ষেপের পর তামাত্তু ও কেরান হজকারীর জন্য একটি বকরি বা এক উটের সাত ভাগের এক ভাগ দমে শোকর বা হজের কুরবানী দেওয়া আবশ্যক। যদি কুরবানী দিতে অক্ষম হন তবে কুরবানীর দিনের আগে তিন দিন এবং হজ পালন শেষ করে সাত দিন রোযা রাখবেন। এই রোযা চাইলে তাশরীকের দিনসমূহের পর মক্কাতেই রাখতে পারে অথবা বাড়ি ফেরার পরও রাখতে পারে। যদি কুরবানীর দিনের পূর্বে তিন দিন রোযা না রাখে তবে পরে রোযা রাখলে হবে না। বরং তাকে কুরবানীই দিতে হবে। (বাকারা ১৯৬, মুসান্নাফে ইবনে শাইবা ৫২২, ৫২৩)

মক্কায় দু'আ কবুল হওয়ার কয়েকটি স্থান

আল্লামা জাযরী (রহ.) হযরত হাসান বসরী (রহ.)-এর সূত্রে মক্কার এমন কিছু স্থান ও সময়ের ব্যাপারে বর্ণিত আছে যেখানে দু'আ কবুল হয়। তা নিম্নরূপ:
১। তাওয়াফের সময়। ২। মুলতাযিমের কাছে। ৩। মীযাবের নিচে। ৪। কা'বা ঘরের অভ্যন্তরে। ৫। জমজম কূপের পাশে। ৬। সাফা পাহাড়ে। ৭। মারওয়া পাহাড়ে। ৮। সাঈর সময়। ৯। মকামে ইবরাহীমের পেছনে। ১০। আরাফার ময়দানে। ১১। মুযদালিফায়। ১২। মীনাতে। ১৩। জামরায়ে উলাতে।১৪। জামারায়ে উস্তাতে। (হাসান ৬৫)
মোল্লা আলী কারী (রহ.) এসবের সাথে আরো যুক্ত করে বলেছেন, রুকনে ইয়ামানী এবং হাজরে আসওয়াদের মাঝামাঝি, দারে আরকাম, গারে সাওর এবং গারে হেরা ইত্যাদিও দু'আ কবুল হওয়ার স্থান। (নযলুল আবরার ৪৫)
সুতরাং হাজী সাহেবানদের উচিত, এসব স্থান ও সময়ে কায়মনোবাক্যে অশ্রুসজল নয়নে আল্লাহর কাছে মন খুলে দু'আ করা।

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা
শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর
অমূল্য বাণী

সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ–এ উম্মতের বৈশিষ্ট্য :

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করা হয়েছে–

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰه

"তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত, মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে, তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর ওপর ঈমান রাখবে। (আলে ইমরান ১১০)

সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের ক্ষেত্রে উম্মতে মুহাম্মদিয়া অন্যান্য উম্মতের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব এই আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

এই আয়াতে বলা হয়েছে (হে উম্মতে মুহাম্মদী!) তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। যাদেরকে মানুষের কল্যাণে, অর্থাৎ হেদায়াতের জন্য প্রকাশ করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ করো এবং অসৎ কাজের নিষেধ করো এবং (নিজেও) আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক অটুট থাকবে।

দ্বীনের প্রতি দাওয়াত মুসলমানদেরকে অবশ্যই উপকার পৌঁছিয়ে থাকে :

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

আপনি মানুষদেরকে বারবার বোঝাতে থাকুন। কেননা নিশ্চয়ই বারবার বোঝানো ঈমানদারদের উপকৃত করবে। (যারিয়াত ৫৫)

তাফসীর বিশারদগণ এই আয়াতের তাফসীর করেছেন, "আপনি আরো মনোযোগের সাথে নিজ কাজে লেগে থাকুন এবং মানুষদের বারবার বোঝাতে থাকুন। কেননা বারবার বোঝানো (যাদের ভাগ্যে হেদায়াত নেই তাদের জন্য তো প্রমাণ সম্পূরক হবে আর যাদের ভাগ্যে ঈমান আছে) ঈমান আনয়নকারীদেরকে আর যারা পূর্ব থেকে মুমিন তাদেরকেও উপকৃত করবে।

বোঝানোর উপকারিতা ও হেকমত সকলের জন্যই রয়েছে। বিধায় আপনি বোঝাতে থাকুন আর কেউ ঈমান না আনলে কষ্ট পাবেন না।

যদি কারো মনে এ সন্দেহ আসে যে, অনেক সময় লাগাতার তাবলীগ ও মেহনত করা হয় অথচ উপকার হয় না! উপকার হওয়া এক জিনিস আর উপকার দৃশ্যমান হওয়া বা অনুভূত হওয়া আরেক জিনিস। কাজেই দৃশ্যমান বা অনুভবযোগ্য না হওয়ার কারণে সেটার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা ভুল।

যেমন কোনো পাথরে পানির ফুটা পতিত হলে সেখানে তৎক্ষণাৎ কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। কিন্তু অনেক দিন একটি পাথরের ওপর পানির ফুটা পতিত হতে থাকলে সেখানে গর্ত হয়ে যায়। এই উদাহরণ থেকে নিশ্চয় বুঝে গেছেন কাজ করতে থাকতে হবে। এর উপকারিতা আছেই।

সামর্থ্য থাকা অবস্থায় গুনাহসমূহ থেকে মুসলমানদের বারণ প্রত্যেক মুসলমানের জিম্মায় জরুরি এবং ঈমানের আলামত :

عن ابى سعيد الخدرىؓ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان۔

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো অন্যায় কর্মকাণ্ড হতে দেখবে সে যেন হাত দ্বারা তাতে বাঁধা দেয় এতে সক্ষম না হলে মুখের দ্বারা, এতেও সক্ষম না হলে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে। আর এটা ঈমানের সর্ব নিম্নস্তর।" সহীহে মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈও ইবনে মাজাহ)

এখানে সামর্থ্যের দ্বারা শরয়ী সামর্থ্য উদ্দেশ্য। কেননা মৌখিক সামর্থ্য তো সব সময়ই থাকে। সামর্থ্যের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন আশংকা না থাকা, প্রবল ধারণা অনুযায়ী যার প্রতিরোধ অসম্ভব। আমাদের দেখতে হবে যেটুকু সামর্থ্য আছে সেটুকু আমরা করছি কি না?

কোনো সম্প্রদায়ের একজন মাত্র গুনাহগারকেও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও গুনাহ থেকে নিবৃত্ত না করলে পুরো সম্প্রদায়ের ওপর আযাব নেমে আসে :

হাদীস শরীফে এসেছে–

عن جرير بن عبد اللهؓ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: مامن رجل يكون فى قوم يعمل فيهم بالمعاصى يقدرون على ان يغيروا عليه ولا يغيرون الا اصابهم الله بعقاب قبل ان يموتو۔

"রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যখন কোনো সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তি গুনাহ করে আর ওই লোকেরা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাকে বিরত না রাখে, তবে মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন।" (সুনানে আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও ইবনে হিব্বান)

এই হাদীসটির বিষয়বস্তু বারবার মনোযোগ দিয়ে বোঝা দরকার। আমার-আপনার ব্যাপক কোনো সামর্থ্য নেই। কিন্তু নিজ স্ত্রী, সন্তান, শিষ্য ও মুরীদদের সংশোধনের সামর্থ্য তো থাকেই। সুতরাং আমরা যদি এইটুকু সামর্থ্যও প্রয়োগ না করি তবে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচা যাবে না।

তাই অন্তত প্রত্যেকে নিজের অধীনস্তদের সংশোধন ও তাদেরকে গর্হিত কাজ থেকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করি।

মাওয়ায়েযে

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)

বিভিন্ন সময় মারকাযের ছাত্রদের উদ্দেশে দেওয়া তাকরীর থেকে সংগৃহীত

আদর্শ তালেবে ইলম

পবিত্র শাওয়াল মাস থেকে দ্বীনি মাদরাসাগুলোর শিক্ষা বছরের সূচনা হয়। দীর্ঘ ছুটিতে বিরান পড়ে থাকা মাদরাসাগুলো ফিরে পায় পুনরায় তার আসল সৌন্দর্য। অযাচিত অনাকাঙ্ক্ষিত শূন্যতা দূর হয়ে ফিরে আসে কোলাহল। ইলমে দ্বীনের পিপাসু তালেবে ইলমরা ইলমের তাড়নায় শত শত মাইল পাড়ি দিয়ে, কত প্রতিবন্ধকতাকে দূরে ঠেলে, পরম স্নেহশীল মা-বাবা এবং আত্মীয়স্বজনকে আল-বেদা বলে, ঘরে থাকা যাবতীয় সুখ-শান্তিকে জলাঞ্জলি দিয়ে, অজানা-অচেনা পরিবেশে মাদরাসাকে আপন ঘর হিসেবে গ্রহণ করে, আসাতেযায়ে কেরামকে পিতৃতুল্য এবং সঙ্গী-সাথীদেরকে ভাইয়ের মর্যাদা দিয়ে বছরের পর বছর–মৃত্যু পর্যন্তের জন্য এ পথের একজন স্বার্থক মুসাফির হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলে। আত্মোৎস্বর্গের বিবেচনার মুসলিম উম্মাহের এই স্তরটিকে দেখা হলে অবশ্যই তাদের উৎসর্গ নজিরবিহীন। তবে তাদের কুরবানীকেও অস্বীকার করা যাবে না, যাদেরকে ছেড়ে তারা মাদরাসায় পাড়ি জমিয়েছে। এসব বিষয়কে সামনে রেখে ভালো মনে করলাম যে, আজিজ তালাবাদের শিক্ষাকালে করণীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রতি দিকনির্দেশনা প্রদান করা বাঞ্ছনীয়। হয়তো তা কোনো তালেবে ইলমের অন্তরে গেঁথে যাবে এবং আলোকিত জীবনের পাথেয় হবে।

নিয়্যাত সহীহ করা :

ইলম উপকারী হওয়ার সম্পর্ক নিয়্যাত সহীহ হওয়া না হওয়ার সাথে। আল্লাহ না করুন, ইলম অর্জন করার উদ্দেশ্য যদি দুনিয়ার মোহ হয় তাহলে এই নিয়্যাত একজন তালেবে ইলমকে দুনিয়াতেই দুনিয়াদারদের সামনে লাঞ্ছিত করে ছাড়বে। আর আখেরাতে সবার আগে জাহান্নামে উপুড় করে নিক্ষেপ করা হবে। এই ইলম হবে তার জন্য অভিশাপের কারণ। হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে–

ان اول الناس يقضى يوم القيامة عليه ... رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فاتى به فعرفه نعمه، فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال : كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارى، فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القى فى النار

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ওই ব্যক্তির ব্যাপারে ফায়সালা করা হবে... যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে) ইলম শিখেছে ও শিখিয়েছে এবং যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত করেছে, কিয়ামতের দিন তাকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হবে। অতঃপর তাকে ইলমের নেয়ামতের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে। সে তা চিনতে পারবে। আল্লাহ বলবেন, এই নেয়ামত অনুযায়ী কী আমল করেছো? সে বলবে, আমি ইলম শিখেছি, শিখিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্য কোরআন তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছো। তুমি তো ইলম শিখেছ মানুষ তোমাকে আলেম বলার জন্য। আর কোরআন তেলাওয়াত করেছ তোমাকে তেলাওয়াতকারী বলার জন্য। দুনিয়াতে তোমাকে তা বলা হয়েছে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার হুকুম করা হবে। এবং তাকে উপুর করে টেনেহিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম)

অন্য এক হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন–

لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولاتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار فالنار

"আলেম সমাজের ওপর বড়ত্ব দেখানো, অবুঝ জনসাধারণের সাথে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়ানো এবং মজলিস জমানোর নিয়্যাতে ইলম অর্জন করো না, যে ব্যক্তি এ রকম করবে জাহান্নামই তার ঠিকানা। (ইবনে মাজাহ)

নিয়্যাত তো এটা হতে হবে যে, এই ইলম দ্বারা পুরো দুনিয়ায় দ্বীনে ইসলামকে যিন্দা করব, এ ধরনের নিয়্যাতকারীর যদি এই অবস্থাতেই মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ তা'আলা ওই তালেবে ইলমের হাশর এভাবে করাবেন যে, তার মাঝে এবং নবীগণের মাঝে শুধুমাত্র একটি স্তরের পার্থক্য থাকবে। যেমন রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন–

من جاء ه الموت وهو يطلب العلم ليحى به الاسلام فبينه وبين الانبياء فى الجنة درجة واحدة۔

"ইসলামকে যিন্দা করার উদ্দেশ্যে ইলম অন্বেষণকারীর মৃত্যু হলে

জান্নাতে তার মাঝে এবং নবীগণের মাঝে শুধুমাত্র একটি স্তরের পার্থক্য থাকবে।" (জামিউ বায়ানিল ইলম)

অতএব সর্বপ্রথম কাজ হলো, নিজের নিয়্যাতকে ঠিক করা আর এ কাজটি বারবার করতে হবে। যখনই অনুভব করবে যে নিয়্যাত বিকৃত হয়ে গেছে তখনই তা ঠিক করে নিতে হবে।

আরেকটি কথা স্মরণ রাখতে হবে, তালেবে ইলমের যমানায় যদি নিয়্যাত ঠিক না হয় তাহলে ইলম অন্বেষণ বন্ধ করা যাবে না। বরং নিয়্যাত দুরস্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবে। নিয়্যাত দুরস্ত হয় না–শুধু এই বাহানায় তালবে ইলম থেকে বিরত থাকা কোনো অবস্থাতেই সমীচীন হবে না। কারণ বুযুর্গদের উক্তি প্রসিদ্ধ–

تعلمنا العلم لغير الله فابى العلم الا ان يكون له۔

"আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করেছিলাম, কিন্তু ইলম আমাদের মনোবাসনা মেনে নেয়নি। শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহর জন্য হয়েই ক্ষান্ত হয়েছে।" অতএব ইলম অন্বেষণ তরক না করে নিয়্যাত দুরস্ত করার প্রতি আত্মনিয়োগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

যোগ্যতাকে দৃঢ় করা :

নিয়্যাত সহীশুদ্ধ করার পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ইলমী যোগ্যতাকে সুদৃঢ় করা। এর জন্য প্রথম দিন থেকেই কোমর বেঁধে নেমে যেতে হবে। মাদরাসাগুলোতে যত ধরনের ইলমের পড়াশোনা হয় সেসব বিষয়ে নিজেকে এ পরিমাণ যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে যেন কারো সামনে কোনো ধরনের দুর্বলতা পরিলক্ষিত না হয়। এবং তোমাদের সামনে যে কেউ যেকোনো বিষয়ে ভুল করে যেন ছাড় পেয়ে না যায়। এমন যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ও দিকনির্দেশনা যারপরনাই ফলপ্রসূ। হযরত বলেন, যে তালেবে ইলম তিনটি কাজ করবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাকে ইলমের দৌলত দান করবেন। ১. মুতালা'আ-অধ্যয়ন করা। ২. মনোযোগ সহকারে নিয়মিত দরসে উপস্থিত থাকা। ৩. তাকরার করা। এই তিনটি কাজ নিয়মতান্ত্রিকভাবে আঞ্জাম দেওয়া সফলতার চাবিস্বরূপ। সংক্ষিপ্তাকারে এই তিনটি জিনিসের পরিচয় তুলে ধরা হলো–

মুতালা'আ :

জানা বিষয়কে অজানা বিষয় থেকে পৃথক করার নাম মুতালা'আ। অর্থাৎ যখন তুমি সবকে অংশগ্রহণের পূর্বে আগামী দিনের সবক মুতালা'আ-অধ্যয়ন করবে এবং সবকটিকে নাহবী, ছরফী ও ভাষাগতভাবে বিশ্লেষণ করবে, তর্জমা, তারকীব এবং ভাব বোঝার চেষ্টা করবে এবং এই প্রচেষ্টায় যে সফলতা তোমার অর্জন হবে, সেটাকে 'মা'লুমাত' বলা হবে। আর যা বুঝে আসবে না তাকে 'মাজহুলাত' বা অজানা বিষয় বলা হবে। মাজহুলাতকে স্মরণ রাখা অতীব জরুরি। যেন অন্য সময় কোনো সাথী ভাই থেকে অথবা সবকে উস্তাদের মাধ্যমে বিষয়টির সহজ সমাধান হয়ে যায়। মুতালা'আর এতটুকু চেষ্টা সাধনা তোমাকে অনেক অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ...

দরসে উপস্থিতি :

মুতালা'আর পরই আসে সবকে নিয়মিত উপস্থিত থাকার বিষয়টি। এ ক্ষেত্রে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে, যেন তোমার থেকে কোনো সবক ছুটে না যায়। এবং অমনোযোগী ও গাফেল হয়ে সবকে বসা না হয়। এই চেষ্টায় সফলতার জন্য আবশ্যকীয় হলো, সবক চলাকালীন উস্তাদের মুখ থেকে যে কথাই নিসৃত হবে তা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং অন্যদিকে কান না দেওয়া। এ রকমভাবে তোমার চোখ উস্তাদের দিকেই নিবিষ্ট থাকতে হবে, চুরি করে এদিক-সেদিক তাকানো যাবে না। আর মন-মস্তিষ্ক থাকতে হবে পরিপূর্ণভাবে সবকমুখী। সবকে আলোচিত বিষয়গুলোকে যেহেনে সংরক্ষণ করার চেষ্টা করতে হবে। পড়ানো শেষ হলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে খাতায় নোট করে নেওয়ার প্রতি হবে যত্নশীল।

তাকরার :

সর্বশেষে তাকরারের স্তর। সবকে আলোচিত ও পড়ানো বিষয়কে অন্যের সাথে আলোচনা করার নাম তাকরার। এই স্তরে এসে মুতালা'আ এবং সবকে থেকে যাওয়া ত্রুটি বিদূরিত হয়। অসম্পূর্ণতার মধ্যে আসে পূর্ণতা। তাকরার যত কার্যকর পদ্ধতিতে করা হবে কিতাবের জ্ঞান ততই বেশি মজবুত ও দৃঢ় হবে। বুযুর্গদের উক্তি প্রসিদ্ধ যে, একজন তালেবে ইলম তাকরারের বেলায় যত অভিজ্ঞ হবে, সে তত উত্তম মুদাররিস হবে। তাকরারের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা হলো তাকরারকারীর যতটুকু উপকার হয় শ্রবণকারীর ততটুকু উপকার হয় না। এ জন্য উত্তম হলো, তাকরার দুজনে করা। একজন বলবে অপরজন শুনবে, এরপর দ্বিতীয়জন বলবে প্রথমজন শুনবে। তাকরারের সঙ্গী বেশি হলে শুধুমাত্র একজনই আলোচক হয় অন্যরা শ্রবণকারী ফলে তারা বেশি উপকৃত হতে পারে না।

সুন্দর লেখনী :

হস্তলিপি সুন্দর হলে একজন আলেমে দ্বীন খুব ভালোভাবে দ্বীনি খেদমত

করতে পারেন। আর পরবর্তী প্রজন্মের ওপর এর প্রভাব ও অত্যন্ত সুখকর হয়। এই বৈশিষ্ট্যটি অর্জনের জন্য প্রত্যেক তালেবে ইলমকে প্রথম দিন থেকেই মেহনত শুরু করে দিতে হবে। সম্ভব হলে কোনো অভিজ্ঞ কাতেবের শরাণাপন্ন হয়ে নিয়মিত মশক করে যেতে হবে। সর্বপ্রথম হুরুফে তাহাজ্জীর গঠন আকৃতিকে নিয়মানুযায়ী যেহেনে সংরক্ষণ করে নিতে হবে। এরপর মুরাককাবাত তথা- যৌগিক শব্দের মশক করতে হবে। উল্লেখ্য, যেকোনো হরফের ব্যবহারের তিনটি সুরত নিশ্চিত। হরফটি শব্দের শুরুতে হবে মাঝে হবে বা শেষে হবে। এই তিনটি অবস্থায় হরফের গঠনাকৃতি কী হবে, এটা শিখে মশক করবে। হস্তলিপি সুন্দর করার আরেকটি সহজ পদ্ধতি হলো, যখনই কোনো কাতেবের লেখা কোনো শব্দ দেখবে তখন শব্দের লেখার ধরনটিকে ভালো করে পরখ করবে এবং পরে হুবহু লেখার চেষ্টা করবে। এভাবে অতি সহজে খুব দ্রুত হস্তলিপি সুন্দর হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ...

নেসাবের বাইরে মুতালা'আ :

দরসে নেজামীর তা'লীমের সাথে সাথে দ্বীনিয়্যাতের মুতালা'আর পরিধি বাড়ানো অতীব জরুরি। দ্বীনি মুতালা'আর পাশাপাশি নিত্যনতুন বিষয়ে সম্যক অবগত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কিতাবাদি পড়তে হবে। যাতে করে আস্থার সাথে বিষয়টির শরয়ী সমাধান পেশ করা যায় এবং এ ব্যাপারে জনসাধারণ যেন তোমাদেরকে অজ্ঞ মনে না করে। তবে এ ক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষণীয় বিষয় হলো, এর দ্বারা নেসাবে তা'লীম ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারবে না। উল্লেখ্য, ছাত্রদের জন্য ক্ষতিকর কোনো কিতাব, বই-পুস্তক অধ্যয়ন করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। যেমন–নোবেল, উপন্যাস, রাজনৈতিক বিষয়ে রচিত বই, পত্রপত্রিকা ইত্যাদি। এ জন্য ঝুঁকিমুক্ত উত্তম পন্থা হলো অভিজ্ঞ উস্তাদদের সাথে পরামর্শ করে পা বাড়ানো। যাঁরা গুরুত্ব বুঝে কোনো বিষয় ও কিতাব ঠিক করে দেবেন। আর এ ধরনের অধ্যয়ন অবসর সময়ে সুযোগ হলে করতে হবে। তা'লীমী আওকাতে নয়।

তাজবীদ ও হিফযুল কোরআন :

যেসব ছাত্ররা হাফেজে কোরআন নয় সাধারণত তারা দু-তিন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। প্রথমত, হাফেজ না হওয়ার কারণে কিছু ক্ষেত্রে তারা কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়ে। যেমন–নামাজ পড়ানোর সময় বিশেষ করে ফজরের নামায পড়ানোর জন্য বললে। অনেকে আবার কাওয়ায়েদে তাজবীদের ব্যাপারে আনকোরা হয়ে থাকে। এ রকমভাবে বয়ান ও তাকরীরে কোরআনের আয়াত জুতসইভাবে প্রয়োগ করতে পারে না। তাই তোমাদের প্রতি আমার ব্যক্তিগত পরামর্শ হলো, শুরু থেকেই তোমরা এই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারে ফিকির মন্দ হও। দৈনন্দিন অল্প অল্প করে মুখস্থ করতে থাকো। বিশেষ করে সর্বশেষ তিনটি পারা এবং বিশেষ বিশেষ ফজীলতপূর্ণ সূরাগুলো মুখস্থ করে নাও। যেমন সূরা ইয়াসিন, সূরা ওয়াকিয়াহ, সূরা আর রহমান ইত্যাদি। আর যারা তাজবীদের ব্যাপারে দুর্বল তারা অভিজ্ঞ কোনো কারীর শরণাপন্ন হয়ে ইলমে তাজবীদ শিখে মশক করে নাও। জুমু'আ দুই ঈদ এবং নিকাহসংক্রান্ত খুতবাও তটস্থ করে নাও। ইনশাআল্লাহ কোথাও কখনো কোনো সমস্যার সম্মুখীন হবে না।

অছাত্রসুলভ কর্মব্যস্ততা :

এ বিষয়টি সব সময় সামনে রাখতে হবে যে তোমরা মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন, ঘরবাড়ি–সব কিছুই ছেড়ে মাদরাসায় এসেছো। উদ্দেশ্য ইলমে দ্বীন অর্জন করা। অতএব তোমাদের জন্য এমন সব ব্যস্ততা প্রোগ্রাম থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা জরুরি, যা তোমাদের তালীমী ক্ষতির কারণ হয়। সবার আগে ক্ষতিকর যে জিনিসটির নাম উচ্চারিত হবে সেটা হলো, কোনো রাজনৈতিক দল বা যেকোনো ধরনের সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া। এই সম্পৃক্ততা একজন তালেবে ইলমের জন্য যহরে কাতেল। তালীমী যমানার প্রতিটি মুহূর্ত তোমাদের জন্য মহা মূল্যবান। এ সময় একাগ্রচিত্তে তালীমের সাথেই তোমাদেরকে লেগে থাকতে হবে, জুড়ে থাকতে হবে। তবে হ্যাঁ, ফারেগ হওয়ার পর কোনো দল বা সংগঠন যদি শরীয়তের কষ্টিপাথরে উতরে যায় তাহলে সেই দল বা সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারো–এটা তোমার ঐচ্ছিক ব্যাপার। অথবা সময়ের দাবি যদি কখনো কোনো ডাকে সাড়া দেওয়ার মতো হয় তবে সে ডাকেও সাড়া দিতে পারবে। মনে রাখবে, সাড়া দেওয়ার সময় এখন নয়। যখন আসবে তখন। সময়ের আগেই কোনো জিনিস পেতে চাইলে, করতে চাইলে বঞ্চনাই তোমার কপালে জুটবে। এখন তালীমের সময় তালীমের সাথে লেগে থাকো। দেখবে সফলতা তোমার পদচুম্বন করবে।

মোবাইল ফোন :

মোবাইল ফোন ছোট একটি আবিষ্কার। যার মধ্যে উপকারী-অপকারী দুটি দিকই রয়েছে। ব্যক্তিবিশেষের জন্য উপকারী হওয়ার দিকটি প্রাধান্য পেলেও

কোনো কোনো ব্যক্তির বেলায় অপকারী হওয়ার দিকটি প্রবল। আবার কারো কারো বেলায় এটা সম্পূর্ণভাবে প্রাণঘাতী। দেখো, এই যন্ত্রটি যাদের আবিষ্কার তারা এর ক্ষতিকর দিকগুলো পর্যবেক্ষণ করে তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে এর অনুপ্রবেশকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করে যাচ্ছে। নামী-দামি স্কুল-কলেজ, ভার্সিটিগুলোতে মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং অমার্জনীয় অপরাধ। আবিষ্কারক হয়েও এর ব্যবহার নিষিদ্ধ ও অমার্জনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করার পরও কি তোমাদের বোধোদয় ঘটবে না। এর পরও কি তোমাদের চক্ষুদ্বয় খুলবে না। অথচ এই যন্ত্রটি তোমাদের ঈমান-আমল ধ্বংসকারী, চরিত্র বিনষ্টকারী, সুস্থতা হরণকারী, অহেতুক ও গুনাহের কাজের প্রতি প্ররোচনা দানকারী, অর্থ ও সময় দুটিকেই মারাত্মকভাবে নিঃশেষকারী, লেখাপড়ায় বিঘ্ন সৃষ্টিকারী। গুরুত্ব সহকারে শোনো, এখানে (মারকাযে) মোবাইল ফোন ব্যবহার, রাখা, সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ ও অমার্জনীয় অপরাধ। এর পরও যদি কেউ মোবাইল রাখে ও ব্যবহার করে বা কোনো রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে আমরা মনে করব সে আমাদের সাথে থাকতে অনিচ্ছুক। বলো তো থাকতে অনিচ্ছুক একজন লোককে আমরা কিভাবে রাখব?

আসাতেযায়ে কেরাম ও ছাত্র ভাইদের হক :

একজন ভালো ও যোগ্য তালেবে ইলমের মকাম হাসিল করতে হলে তোমার অন্তরে আসাতেযায়ে কেরামের প্রতি অগাধ মহববত থাকতে হবে। তাঁদের প্রতি যারপরনাই একরাম-এহতেরাম প্রদর্শন করতে হবে। তাঁদের বৈধ আদেশ শুনতে হবে মানতে হবে। তাঁদের উপদেশ বাণীকে সফলতার চাবি মনে করতে হবে। বলার অপেক্ষা না করে খেদমতের উপযুক্ত কাজ খুঁজে খুঁজে করতে হবে। যে তালেবে ইলম এসব কাজ আন্তরিকভাবে করবে তার উন্নতি দ্রুত, অতি দ্রুত সাধিত হবে। মনে রাখবে, যারা এসব কাজ বদনিয়্যাতে, বাধ্য হয়ে বা কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে করবে তারা সফলতা নয়, ধ্বংস ও বরবাদীর অপেক্ষা করতে পারে!

তালীমী যমানায় আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে। সেটা হলো, সাথীদের সাথে আচার-ব্যবহার। দেখো! একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাকে ইজতেমায়ী পরিবেশে থাকতে হবে। এই পরিবেশে কিছু সময় তোমার দরসেগাহের সাথীদের সাথে ব্যয় করতে হবে। কিছু সময় কামরার সাথীদের সাথে থাকতে হবে। আর কিছু সময় দিতে হবে প্রতিষ্ঠানের সমস্ত ছাত্রের সাথে। এই তিনটি স্তরের প্রতিটির বেলায়ই যদি নিজের ব্যাপারে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো যে, আমি আমার সব ধরনের সাথীর সর্বপ্রকার হক আদায়ে সচেষ্ট থাকব। আমার দ্বারা কাউকে কোনো ধরনের কষ্ট পেতে দেব না। অনুমতি ছাড়া কারো কোনো জিনিস ব্যবহার করব না। তবে দেখবে আল্লাহ তা'আলা এই পবিত্র গুণের কারণে সকল সাথীর অন্তরে তোমার একরাম-এহতেরাম, ইজ্জত, মহব্বত ঢেলে দেবেন। এভাবে নিজেকে গড়ে তুলতে না পারলে তুমি আশান্তিতে ভুগবে। সবাই তোমার থেকে দূরত্ব বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। যে রকমভাবে হিংস্র জন্তু এবং কষ্টদায়ক প্রাণী থেকে মানুষ নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে থাকে। তোমার অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য সাথীরা তোমার সাথে সালাম-কালাম করবে না। করলেও আন্তরিকভাবে ঘৃণা করবে এবং বদ-দু'আ করবে। বলো তো এর চেয়ে বড় হতভাগা আর কে হতে পারে?

নিজেকে একজন ভালো ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত করার জন্য বলিষ্ঠভাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো যে, যখন যার সাথেই মিশতে হবে এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে মিশবে, যেন পরবর্তীতে সে তোমার দিদার ও সাক্ষাৎ আন্তরিকভাবে কামনা করে। কিছু সময় তোমার সাথে বসা ও সময় কাটানোকে নিজের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার মনে করে। তবেই তুমি সবার প্রিয় পাত্রে পরিণত হতে পারবে।

মাদরাসার নিয়মকানুন :

ইলমের তরক্কীর জন্য কিছু কাজ জরুরি। এর মধ্যে হতে একটি হলো, প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় নিয়মনীতি, আইনকানুন মেনে চলা। অনস্বীকার্য বিষয় হলো, কোনো প্রতিষ্ঠান নিয়মনীতি, আইনকানুন ছাড়া চলতে পারে না। এসব কিছুই করা হয় নেজামকে দুরস্ত রাখার খাতিরে। আর প্রতিষ্ঠানের আইনকানুন মেনে চললে ইলম অর্জনের পথ মসৃণ-কণ্টকমুক্ত হবে। ইলমী তরক্কী পদ চুম্বন করতে সময় নেবে না। জীবন হবে ধন্য, সুখী ও পরিমার্জিত। সবাই তোমার ওপর সন্তুষ্ট থাকবে। যেমন– তুমি নিয়ম করে নাও, দরসের সময় হওয়ার সাথে সাথে দরসেগাহে উপস্থিত হবে। খাওয়া-দাওয়ার সময় হলে খেতে চলে যাবে। ঘুমের সময় হলে ঘুমিয়ে যাবে। আর যখন দরসেগাহ, থাকার কামরা ও প্রতিষ্ঠানিক

পরিষ্কার-পরিচ্ছনতা বা যেকোনো খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার পালা আসে তখন তা নিষ্ঠার সাথে পালন করো। দেখবে মাদরাসার কোনো উস্তাদ-ছাত্র তোমার দ্বারা কষ্ট পাবে না। তোমার ব্যাপারে তাদের কোনো অভিযোগও থাকবে না। নিজেও কারো কাছ থেকে অযাচিত ব্যবহারের মুখোমুখি হবে না।

এসলাহে নফস :

অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা হলো, বছরের পর বছর এভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম ও মেহনত করে যাওয়ার মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য একটাই, আল্লাহর যাবতীয় হুকুম-আহকাম মেনে রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতের ইত্তেবার মাধ্যমে ধাপে ধাপে, ধীরে ধীরে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা এবং সিদ্দিকীন ও সালেহীনদের কাতারে নিজেকে শামিল করা। সবাইকে এদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে, যেন জীবনের কোনো ক্ষেত্রে কোনো কাজ সুন্নাতে রাসূল (সা.)-এর খেলাফ না হয়, সুন্নাত মোতাবেক জীবন গঠনের চেষ্টা করা জীবনের সব ধরনের চেষ্টা প্রচেষ্টা থেকে মহা মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ। তোমরা রাসূল (সা.)-এর ওয়ারিশ মানে ইলম, আমল ও আখলাকের ওয়ারিশ। অন্য কিছুর না। অতএব তোমাদের মাঝে যদি সুন্নাতের ইত্তেবা ও আখলাকে নববীর লেশ মাত্র দেখা না যায় তবে বলো তো নিজেকে কিভাবে নবীর ওয়ারিশ বলে দাবি করবে! এ ধরনের দাবি কি মিথ্যা ও ভণ্ডামীর অন্তর্ভুক্ত হবে না? মাদরাসায় পড়ার আগে পরের জীবনের মধ্যে যদি কোনো পার্থক্য গড়ে তুলতে না পারো তাহলে মাদরাসায় পড়ার স্বার্থকতা রইল কী? অতএব তোমাকে ইবাদত, মুআমালাত, মুআশারাত, আখলাক চরিত্র ও খেদমতে খলকের এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে, যেন মানুষ নিজের সন্তানদেরকে তরবিয়ত প্রদানকালে তোমাকে উদাহরণ-উপমা হিসেবে পেশ করে। তোমাকে দেখে সবাই যেন এই তামান্না করে যে, আহ! আমার সন্তানও যদি এ রকম হতো! বাস্তবে যদি তোমরা প্রত্যেকে এ রকম হতে পারো তবে তোমরা মেছালী তালেবে ইলম হতে পারবে। মানুষ নিজেদের মাথায় তোমাদের স্থান দেবে। তোমাদের ইজ্জত এহতেরাম করবে, তোমাদেরকে মহব্বতের নজরে দেখবে, মনোযোগ সহকারে তোমাদের কথা শুনবে, যেকোনো ব্যাপারে তোমাদের পরামর্শ গ্রহণ করবে, তোমাদের সান্নিধ্যে থাকার চেষ্টা করবে, তোমাদের কোনো খেদমত করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবে, সন্তানদের তরবিয়ত দানকালে তোমাদেরকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করবে এবং নিজেদের সন্তাদেরকেও মাদরাসায় পড়ানোর জন্য উদ্বুদ্ধ হবে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা তোমার পদচুম্বন করবে। মনে রাখবে, ইসলাহ নিজে নিজে করা যায় না এর জন্য কোনো মুসলেহ মুরব্বির শরণাপন্ন হতে হবে। আল্লাহ সবাইকে তাওফীক দান করুন। আমীন.....

গ্রন্থনা : মুফতী নুর মুহাম্মদ

চশমার জগতে যুগ যুগ ধরে বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত

মেহবুব অপটিক্যাল কোং

এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।
পাইকারি ও খুচরা দেশি-বিদেশি চশমা সুলভ মূল্যে বিক্রি করা হয়।

১২ পাটুয়াটুলি রোড, ঢাকা ১১০০
ফোন : ০২- ৭১১৫৩৮০ , ০২- ৭১১৯৯১১

১৩ গ্রীন সুপার মার্কেট, গ্রীন রোড, ঢাকা-১২১৫। ফোন : ০২-৯১১৩৮৫১

'সিরাতে মুস্তাকীম' বা সরল পথ

লা-মাযহাবী বন্ধুরা! দয়া করে জবাব দেবেন কি?

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

আহলে হাদীস নামধারী লা-মাযহাবী বন্ধুরা সেই যে ১৮৭৯ সাল থেকে 'চ্যালেঞ্জ', 'ওপেন চ্যালেঞ্জ' আর রুপি-টাকার টোপসংবলিত লিফলেট প্রকাশ করে আসছেন, তার আর থামাথামি নেই; থামার লক্ষণও নেই। পার্থক্য এতটুকু যে সেকালের দশ রুপি একালে এসে লাখের ঘর ছাড়িয়েছে। এসব লিফলেটে তারা উম্মাহর প্রথম সারির উলামায়ে কেরাম ও মাযহাবের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ইমামগণের প্রতি লাগামহীন বিষোদগার করে থাকে। পাশাপাশি উম্মতের সর্ববাদী দ্বীনি সিদ্ধান্ত ও 'আমালুল মুতাওয়ারাস' তথা প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম পরম্পরায় নির্দ্বিধায় পালিত বিভিন্ন আমলের প্রামাণ্যতার বিরুদ্ধে বাহারি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। তাদের এসব চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় সরলমনা সাধারণ দ্বীনদার ভাইয়েরা, যারা কোরআন-সুন্নাহয় বিশেষজ্ঞ নন– দোটানায় পড়ে যান এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিভ্রান্তও হন। মুসলিম জনসাধারণের ঈমান-আমল হেফাযতের উদ্দেশ্যে তাদের লিফলেটবাজির জবাবে সর্বপ্রথম কলম দেগেছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম সন্তান হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.)। তাঁর লিখিত 'আদিল্লায়ে কামিলাহ' ও 'ঈযাহুল আদিল্লাহ' ওদের দাঁতই ভেঙে দেয়নি; মাড়ি-চোয়ালও আলগা করে দিয়েছিল। যার জবাব আজ ১৩৫ বছর পর্যন্তও ওরা দিতে সক্ষম হয়নি, ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত সক্ষম হবেও না। কিন্তু 'যার যা স্বভাব'। ওরা লিফলেটবাজি বন্ধ করেনি। সত্য প্রকাশের দায়বোধ থেকে তাই উলামায়ে কেরামও কলম বন্ধ করেননি। সেই ধারাবাহিকতায় শুধুমাত্র কোরআন ও সহীহ হাদীস মানার দাবিদার (ইজমা, কিয়াস নয়) লা-মাযহাবী বন্ধুদের নিকট আমরা কিছু প্রশ্ন রাখছি। প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব এ দেশের দ্বীনদরদি প্রতিটি মুসলমানই আন্তরিকভাবে কামনা করে।

১. আমাদের হাদীস মানতে হবে–এ বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট ও সহীহ হাদীস পেশ করুন (দয়া করে 'সুন্নাহ' মানার হাদীসকে 'হাদীস' মানার হাদীস হিসেবে চালিয়ে দেবেন না।)

২. একটি সহীহ হাদীসের মাধ্যমে সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা পেশ করুন।

৩. হাদীস ও সুন্নাত কি একই জিনিস? রাসূল (সা.) আমাদের হাদীস মানতে বলেছেন, নাকি সুন্নাত মানতে বলেছেন–প্রমাণসহ বলুন?

৪. ইজমা ও কিয়াস শরীয়তের দলিল হওয়ার বিষয়টি কোরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। যেমন : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

অর্থ : কারও নিকট হিদায়াতের পথ প্রকাশিত হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মু'মিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে আমি তাকে সেদিকেই ফিরিয়ে দেব, যেদিকে সে ফিরে যায় এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা বড় মন্দ আভাস! (সূরা নিসা, আয়াত নং ১১৫) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের এবং তাঁদের, যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্বশীল। কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা পেশ করো আল্লাহ ও রাসূলের নিকট, যদি তোমরা আখিরাতে বিশ্বাস করো। এটাই উত্তম ও পরিণামে প্রকৃষ্টতর। (সূরা নিসা, আয়াত নং ৫৯)

সুতরাং আপনারা যে ইজমা, কিয়াসকে শরীয়তের দলিল মানেন না, যার ফলে কোরআনের এসব আয়াতকে অস্বীকার করা হয়, এতে আপনাদের ঈমানের ব্যাপারে আপনাদের সিদ্ধান্ত কী?

৫. ইজমা ও কিয়াসের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া সরাসরি কোরআন-হাদীসের ভাষ্য দ্বারা নিম্নোক্ত আধুনিক মাসআলাগুলোর সমাধান পেশ করুন।

☆ চেয়ারে বসে নামায আদায় করা জায়েয আছে কি না?

☆ ডেসটিনি-২০০০ লিঃ জায়েয হবে

কি না?

☆ প্রাইজবন্ড কেনা জায়েয হবে কি না?

☆ প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা ও লভ্যাংশ গ্রহণ করা জায়েয হবে কি না?

☆ বর্তমান শেয়ারবাজারে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে কি না?

☆ প্লাস্টিক সার্জারি করা জায়েয হবে কি না?

☆ বীমা-ইনস্যুরেন্স করা জায়েয হবে কি না?

☆ ট্রেডমার্ক বেচাকেনা জায়েয হবে কি না?

☆ বিমানে নামাজ পড়া জায়েয হবে কি না?

☆ দেশি-বিদেশি কাগজের নোট পরস্পরে কম-বেশি মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয হবে কি না?

যদি কোরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট ভাষ্য দ্বারা এর উত্তর দিতে না পারেন তাহলে

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম"–এ আয়াতের প্রেক্ষিতে দ্বীন কিভাবে পূর্ণাঙ্গ হলো তা শুধুমাত্র কোরআন ও সহীহ হাদীসের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করুন।

৬. আপনাদের লেখা তাফসীর-উসূলে তাফসীর, হাদীস-উসূলে হাদীস, ফিকহ ও উসূলে ফিকহের কোনো কিতাব আছে কি? থাকলে সেগুলোর নামধাম ও কোন সালে তা লেখা হয়েছে, জানিয়ে বাধিত করুন।

৭. আপনাদের দাবি হলো, আপনারা সহীহ বুখারী মানেন। তো প্রশ্ন হলো,

☆ ইমাম বুখারী (রহ.) তো বুখারী শরীফে তিন তালাকে তিন তালাক পতিত হওয়ার কথা বলেছেন; (হাঃ নং ৫২৫৯,) তাহলে আপনারা কেন তিন তালাকে এক তালাকের কথা বলেন?

☆ ইমাম বুখারী (রহ.) দুই হাত দিয়ে মুসাফাহার কথা বলেছেন (হাঃ নং ৬২৬৫) আপনারা কেন এক হাত দিয়ে মুসাফাহার কথা বলেন?

☆ ইমাম বুখারী (রহ.) আবু হুমাইদ আস সায়েদীর সূত্রে নবীজির নামাযের বর্ণনা দিয়েছেন (হাঃ নং ৮২৪) সেখানে মাত্র একবার হাত তোলার কথা আছে, তাহলে আপনারা কেন নামাযে বারবার হাত তোলেন?

☆ বুখারী শরীফে আছে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একই সময়ে ৯ জন বিবির সঙ্গে সংসার করেছেন, তো আপনারা কেন হাদীসের ওপর আমল করে ৯ বিবি নিয়ে সংসার করছেন না?

৮. বুখারী শরীফের সব হাদীস কি আমলযোগ্য, বিশেষ করে যেসব হাদীস নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরবর্তী স্পষ্ট নির্দেশনা দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে, যেমন–

☆ বুখারী শরীফের কিতাবুল জানায়েযের ১৩০৭ থেকে ১৩১৭ নং হাদীসসমূহ। এসব হাদীসে কাউকে জানাযা নিয়ে যেতে দেখলে সকলকে দাঁড়িয়ে যেতে বলা হয়েছে। অথচ এই বিধান অন্যান্য সহীহ হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। (উমদাতুল কারী ৬/১৪৬)

☆ ইসলামের প্রথম যুগে নামাযরত অবস্থায় কথা বলা, সালাম দেওয়া, সালামের উত্তর দেওয়া–সবই বৈধ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে এই বিধান রহিত হয়ে গেছে। (সহীহ বুখারী, হাঃ নং ১১৯৯, ১২০০)

☆ নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হিজরতের পর মদীনায় ১৬/১৭ মাস বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায আদায় করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে এই বিধান রহিত হয়ে যায়। (সহীহ বুখারী, হাঃ নং ৭২৫২)

☆ হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত বুখারী শরীফের ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩২ নং হাদীসগুলো যেখানে বীর্যপাতহীন সহবাসে গোসল ফরয না হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো স্বয়ং হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত সহীহ ইবনে হিব্বানের ১১৭৬ নং হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে, যেখানে বীর্যপাতহীন সহবাসের দ্বারাও গোসল ফরয হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

জানার বিষয় হলো, আপনারা এসব রহিত হাদীসের ওপর কিভাবে আমল করেন?

৯. আপনারা শুধু বুখারী শরীফ মানতে চান, তাহলে বুখারী শরীফের সব হাদীস মিলিয়েই না হয় দুই রাক'আত নামায আদায়ের পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি পেশ করুন।

১০. আপনারা নির্দিষ্ট ইমামের তাকলীদ (অনুসরণ) করাকে শিরক বলে থাকেন, তাহলে এযাবৎকাল যত বড় বড় মুহাদ্দিস হাদীস সংকলন করেছেন, তাফসীরবীদগণ তাফসীর লিখেছেন– তাঁরা সকলেই তো কোনো না কোনো নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসরণ করেছেন, তাহলে তাঁরা সকলেই কি মুশরিক হয়ে গেছেন?

আপনাদের দাবির আলোকে মাযহাব গ্রহণের শিরক করার কারণে তাঁরা যদি সত্যি সত্যিই ঈমানহারা হয়ে থাকেন, তাহলে কিভাবে আপনারা তাঁদের কিতাব থেকে হাদীসের দলিল পেশ করেন? এবং কিভাবে তাঁদের কিতাবের ভিত্তিতে কোনো হাদীসকে সহীহ, কোনো হাদীসকে যয়ীফ বলেন? এতে কি মুশরিক ও বেঈমানদের কিতাব দ্বারা দলিল দেওয়া হয় না?

লেখক : প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস, জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়া আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

হজের তারিখ নিয়ে বিভ্রান্তির অবকাশ নেই

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী

ইসলামের মূল পাঁচটি ভিত্তির একটি হলো পবিত্র হজ। এ হজ হলো আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের অন্যতম উপায়। তাঁর রহমত অর্জনে ধন্য হওয়ার শ্রেষ্ঠ সুযোগ। হজের প্রধান কাজ আরাফায় অবস্থান। মুসলিম মিল্লাতের ঐকমত্যে ৯ই যিলহজ হলো আরাফায় অবস্থানের দিন। একমাত্র এই দিনই হজ পালনের নির্ধারিত তারিখ। এর কোনো ব্যতিক্রম বা বিকল্প ব্যবস্থা কোরআন-হাদীসে নেই। নেই ইসলামে আদৌ এমন কোনো ইঙ্গিতমাত্র। হযরত ইবরাহীম (আ.) থেকে অদ্যাবধি এভাবেই চলে আসছে। চলবে কেয়ামত পর্যন্ত এভাবেই ইনশাআল্লাহ। মুসলিম বিশ্বে এ নিয়ে কোনো বিতর্কও ছিল না। উল্লেখযোগ্য কোনো কিতাবপত্রে ৯ তারিখ ব্যতীত হজ আদায় করা যাবে কি না, এমন কোনো কাল্পনিক আলোচনাও স্থান পায়নি। সাম্প্রতিককালে আহলে কোরআন নামক একটি মতবাদের কিছু যুক্তি-তর্ক ইন্টারনেট ও বিভিন্ন লিফলেট বিজ্ঞাপনে লক্ষ করা যাচ্ছে। তাদের দাবি হলো, শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ এই মাসগুলোতে যেকোনো দিন হজ আদায় করলে হজ আদায় হয়ে যাওয়ার কথা। তাদের ভাষ্য মতে, কোরআনেও এমনই আছে। আর এ দীর্ঘ সময়ের যেকোনো দিন হজ আদায় করার সুযোগ দেওয়া হলে বর্তমানের প্রচণ্ড ভিড় ও হতাহত অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। আমার ধারণা মতে, তারা আহলে কোরআন মতবাদের অনুসারী। যারা শুধু কোরআন মানে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তাদেরকে সঠিক দল হিসেবে গণ্য করেনি। কেননা কোরআন-হাদীস, ইজমা-কিয়াসকে যারা দলিল হিসেবে গ্রহণ করে তারাই হলেন সঠিক পথের পথিক। পরন্তু হজ সম্পর্কে উপস্থাপিত তাদের যুক্তিতর্কগুলোর সঠিক সমাধান মুসলমানদের খেদমতে উপস্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। আলোচনার শুরুতেই ৯ই যিলহজে হজ আদায় করার কারণগুলো অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করব।

হজের তারিখ ৯ই যিলহজ কেন

হজ হবে প্রতিবছর যিলহজ মাসের ৯ তারিখে। ওই দিনকেই আরাফার দিন বলা হয়। এ মর্মে কোরআন-হাদীসে যথেষ্ট দলিল-প্রমাণ রয়েছে। রয়েছে মুসলিম বিশ্বের ধারাবাহিক ইজমা ও ঐকমত্য। নিম্নে আংশিক আলোকপাতের প্রয়াস পাব।

এক. হজের নিয়মনীতি ও তারিখ আল্লাহ প্রদত্ত :

হজের নিয়মনীতি ও তারিখ স্বয়ং আল্লাহ পাক কর্তৃক প্রদত্ত ও নির্দেশিত হওয়ার কারণে এতে মানবকল্পিত কোনো পরিবর্তন বা পরিমার্জনের সুযোগ নেই। নেই আগে-পরে করার কোনো উপায়। আল্লাহ পাক এ ধারায়ই নবী হযরত ইবরাহীম (আ.) কে হজ পালনের নির্দেশ করেছেন। কোরআনে কারীমের ইরশাদ–

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُود.

আর যখন আমি কা'বাগৃহকে মানুষের জন্য সম্মিলনস্থল ও শান্তিআলয় করলাম এবং ইবরাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে নামাযের জায়গা বানাও। আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী ও রুকু-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখো। (সূরা বাকারা-১২৫)

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا... وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١٢٨)

স্মরণ করো, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিল। তারা দু'আ করেছিল, পরওয়ারদেগার! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন। ...আর আমাদের হজের রীতিনীতি বলে দিন। (সূরা বাকারা-১২৯)

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (٢٦) وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (٢٧) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَات..

"যখন আমি কা'বাগৃহের স্থান ঠিক করে দিয়ে বলেছিলাম, আমার সাথে কাউকে শরীক করো না। আর আমার গৃহকে পবিত্র রাখো তাওয়াফকারীদের জন্য, নামাযে দণ্ডায়মানদের জন্য ও

রুকু-সিজদাকারীদের জন্য এবং হজের জন্য মানুষের মধ্যে ঘোষণা করো। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে, সর্বপ্রকার উটের পিঠে আরোহন করে দূর-দূরান্ত থেকে। যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থান পর্যন্ত পৌঁছে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে।" (সূরা হজ ২৬-২৮)

দিকনির্দেশনা

উল্লিখিত আয়াতগুলোতে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাচেছ যে হজের যাবতীয় বিধিবিধান ও সুনির্দিষ্ট সময় আল্লাহ পাক ইবরাহীম (আ.) কে বলে দিয়েছিলেন। যে বিবরণ মতো তিনি হজ পালন করেছেন। এভাবেই হজ পালনের জন্য তিনি লোকদের ঘোষণা করেছেন। যে ধারা আজও প্রবর্তিত আছে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় হলো, আল্লাহ পাক ইবরাহীম (আ.) কে নির্দেশ করেন, أذّن فى الناس بالحج (হজের জন্য মানুষের মধ্যে ঘোষণা করো।) সাথে সাথে তিনি তাকে বলেন, "يذكروا اسم الله فى أيّام معلومات (যাতে তারা নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে) এ পদ্ধতিতেই বোঝা যাচ্ছে ইবরাহীম (আ.) হজ পালনের ওই নির্দিষ্ট দিনগুলো আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে জ্ঞাত হয়েছেন ও তিনি তা ভালোভাবে জানতেন। এ অনুযায়ী লোকদের হজের জন্য ঘোষণা করেছেন এবং নিজেও পালন করেছেন। এ ঘোষণা অনুযায়ী বিশ্বজগৎ হজ পালন করেছে। হজ পালন করেছে বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম। চলবে কেয়ামত পর্যন্ত এ ঘোষণা অনুযায়ী। এতে চিন্তা-গবেষণার কোনো অবকাশ নেই। (মাওসুয়াতুল ফিক্বহিল কুরআনী আল মুয়াছির মুহা: সাঈদ মুশতাহিরী, দেখুন বয়ানুল কুরআন থানভী ২/৬১৫)

দুই. রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবাগণ যিলহজের ৯ তারিখেই হজ করেছেন :

রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবাগণের বিশাল জামা'আত নিয়ে হজ করেছেন। তাঁদের সবাই যিলহজ মাসের ৯ তারিখে আরাফায় অবস্থান করেছেন। তাঁদের কোনো একজনও আগে-পরে করেননি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যিলহজের ৪ তারিখ মক্কায় পৌঁছেছিলেন। এদিনসহ পাঁচ দিন অন্তর ৯ তারিখে আরাফায় অবস্থান করেন। পরের রাতে মুযদালিফায়, এরপরের তিন দিন মীনায় অবস্থান করেছেন। (তবক্বাতে ইবনে সা'দ ১/৪৭৮, ৪৬৯)

কুরবানীর দিনে খুতবায় রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবাগণকে জিজ্ঞাসা করেন–

أتدرون أىّ يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم ، فسكت حتى ظننا أنه سَيُسمِّيه بغير اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى قال: أى شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى ـ

তোমরা কি জানো আজ কোন দিন? সাহাবাগণ বলেন, আমরা বলি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চুপ। আমরা ভাবছি, তিনি হয়তো এ দিনটিকে অন্য কোনো নামে নামকরণ করবেন। তিনি বলেন, আজ কুরবানীর দিন নয়? আমরা বলি, হ্যাঁ! তিনি প্রশ্ন করেন, কী মাস এটি? আমরা বলি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চুপ। আমরা ভাবছি, তিনি হয়তো এ মাসটিকে অন্য কোনো নামে নামকরণ করবেন। তিনি বলেন, এ মাসটি যিলহজ নয়? আমরা বলি হ্যাঁ! (সহীহ বুখারী ১৭৪১, সহীহ মুসলিম ১৬৭৯)

মীনায় দুই দিন বা তিন দিন অবস্থানের ক্ষেত্রে ইচছাধীন হলেও আরাফায় অবস্থানের ক্ষেত্রে কাউকে আগে-পরে করার অনুমতি দিয়েছেন বা কেউ ব্যতিক্রম করেছে তা ইতিহাসে, হাদীস গ্রন্থে নেই। বরং সর্বসম্মতিক্রমে যা বর্ণিত হয়ে আসছে, তা-ই আমাদের জন্য আমল করার দলিল।

উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবাগণের উক্তি যেভাবে হাদীস ও দলিল হিসেবে গণ্য হয় তেমনিভাবে তাঁদের অনুসৃত আমল হাদীস এবং আমাদের জন্য দলিল হিসেবে গণ্য হবে।

তিন. হজের তারিখ নিয়ে মতানৈক্য কোরআনে নিষিদ্ধ :

ইসলামী শরীয়ত প্রবর্তনের পূর্বে জাহেলী সম্প্রদায়ের কিছু মূর্খ লোক হজের তারিখ প্রসঙ্গে মতানৈক্য করেছিল। কেউ কেউ মুযদালিফার সময়ে আরাফায় আবার কেউ কেউ আরাফার সময়ে মুযদালিফায় অবস্থান করত। একইভাবে কেউ কেউ হজ পালন করত শাওয়ালে, কেউ করত যিলকদে আর কেউ যিলহজ মাসে। এসব নিয়ে তাদের মধ্যে এক ধরনের মতানৈক্য ও বিবাদের রূপ ধারণ করছিল। এ পরিস্থিতিতে কোরআনে কারীমে ঘোষণা আসে– ولاجدال فى الحج হজের তারিখ-মাস ইত্যাদি নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ ও মতানৈক্য করার কোনো অবকাশ নেই। (বাকারা ১৯৭)

এ আয়াতের আলোকে হজের তারিখ প্রসঙ্গে সব বিবাদ মিটে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম ৯ই যিলহজে হজ পালন করেন। অনন্তকালের জন্য হজের এ তারিখ অবধারিত হয়ে পড়ে। চলে যায় মতানৈক্যের সব সুযোগ। (তাফসীরে মাযহারী ১/২৩৪, তাফসীরে কাবীর ৩/১৭৭)

চার. আরাফায় অবস্থানই হজ

আব্দুর রহমান বিন ইয়া'মুর থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত, নজদ সম্প্রদায়ের কিছু

লোক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসে, তখন তিনি আরাফায় অবস্থানরত ছিলেন। তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে হজ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে। একপর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "হজ হলো আরাফায় অবস্থান।" (নাসাঈ-৩০৪৪, তিরমিযী ৮৮৯-৮৯০, আবু দাউদ ১৯৪৯ হাদীস সহীহ)

উপরোক্ত হাদীসের আলোকে আরাফায় অবস্থানের অপর নাম হজ। তাই আরাফায় অবস্থানই হলো হজের বৃহত্তম কাজ ও বড় একটি রুকন। আর নির্ভরযোগ্য দলিল-প্রমাণের আলোকে জিলহজের ৯ তারিখই হলো আরাফার দিন। অতএব হজের মূল কাজটিই হলো, যিলহজের ৯ তারিখ। এদিন ব্যতীত কোনোভাবে হজ আদায়ের চিন্তা করা যায় না। আরবী অভিধানের কিতাবগুলোতে আরাফার দিন চিহ্নিত করে লেখা আছে–

يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذى الحجة..

"আরাফার দিন হলো, যিলহজ মাসের ৯ তারিখ। (দেখুন মুজামুল ওয়াসিত, পৃ. ৬২৫عرفات)

আরাফার দিনের পরিচয় হিসেবে তাফসীরের কিতাবসমূহে নির্দিষ্ট একটি দিন বলে উল্লেখ করেছে। ইমাম বগবী (রহ.) লেখেন,

هو اسم لليوم التاسع من ذى الحجة وهو يوم الوقوف بعرفات.

আরাফার দিন হলো, যিলহজ মাসের ৯ তারিখ। সে দিনটি আরাফায় অবস্থানের দিন। (তাফসীরে বগবী ১/১৭১, রুহুল মা'আনী ১/৪৮৩, রাওয়াইউল বয়ান-ছাবুনী ১/২৫০)

ইমাম নববী (রহ.) লেখেন, হজের দিন সাতটি। যিলহজের ৭ তারিখ দ্বিপ্রহরের পর থেকে প্রথম দিন। আর ১৩ তারিখ দ্বিপ্রহরের পর থেকে শেষ দিন গণ্য হয়। সেটি আইয়্যামে তাশরীকের শেষ দিন। ৭ তারিখের কোনো নাম নেই। ৮ তারিখকে তারবিয়্যার দিন বলা হয়। ৯ তারিখ হলো আরাফার দিন আর ১০ তারিখ কুরবানীর দিন। (আল মাজমু' ৮/৮২)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত অসংখ্য বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে বোঝা যায়, আরাফাহ একটি সুনির্দিষ্ট দিন ও তারিখের নাম। যেকোনো দিন অবস্থান করলে আরাফায় অবস্থান গণ্য হবে না।

হযরত অরওয়া বিন মুযাররিস (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট পৌঁছলাম, যখন তিনি নামাযের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি 'ত্বাই' শহরের দু'পাহাড় থেকে এসেছি। আমার বাহন ও আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি। আল্লাহর কসম, আমি যত পাহাড় পেয়েছি, সবকটি পাহাড়েই অবস্থান করেছি। আমার হজ কি আদায় হয়েছে? তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন–

من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتمّ الحج.

যে ব্যক্তি মুযদালিফায় আমাদের সাথে এই নামাযে উপস্থিত হয়েছে এবং এখানে শেষ পর্যন্ত অবস্থান করেছে আর এর আগে রাতে বা দিনে আরাফায় অবস্থান করেছে তার হজ পূর্ণ করেছে।

উপরোক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কয়েকটি বিষয় বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে–

১. হজ পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য মুযদালিফায় অবস্থান জরুরি।

২. মুযদালিফায় অবস্থানের আগে ওই রাতে বা দিনে আরাফায় অবস্থান করতে হবে। وقف بعرفة قبل ذلك দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

৩. যিলহজের ৯ তারিখে আরাফাহ ও দিবাগত রাতে মুযদালিফায় অবস্থান করতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ووقف معنا আমাদের সাথে যারা অবস্থান করেছে, তারা তাদের হজ পূর্ণ করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) যেহেতু ৯ তারিখে অবস্থান করেছিলেন, তাই যারা এর আগে বা পরে যেকোনো মাসের যেকোনো তারিখে অবস্থান করেছে, বা করবে তাদের হজ হবে না।

পাঁচ. ইজমা

ইবরাহীম (আ.)-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম মিল্লাত একমাত্র ৯ তারিখেই হজ আদায়ের ওপর ঐকমত্য। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের কারো কোনো দ্বিমত নেই।

প্রখ্যাত ইমাম মুহাম্মদ আলী ছাবুনী লেখেন–

يرى جمهور العلماء أنَّ وقت الوقوف بعرفة يبتدئ من زوال اليوم التاسع إلى طلوع الفجر اليوم العاشر

সমগ্র উলামায়ে জমহুরের মত হলো, আরাফায় অবস্থানের সময় ৯ই যিলহজ দ্বিপ্রহরের পর থেকে ১০ তারিখ সুবহে সাদিকের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত।

ইমাম ইবনে আব্দিল বার (রহ.) লেখেন–

ومراعاة عرفة بإدراك الوقوف بها ليلة النحر قبل طلوع الفجر إجماع من العلماء

ইয়াওমুন নাহর বা ১০ যিলহজের পূর্বের রাতের সুবহে সাদিকের আগে আগে আরাফায় অবস্থান করার ক্ষেত্রে সব উলামায়ে কেরামের ইজমা ঐকমত্য। (আত তামহীদ ১/৮৬)

তিন মাসের যেকোনো দিনে হজ করা প্রসঙ্গে কিছু ভ্রান্ত ধারণা ও এর নিরসন

সংশয় ও নিরসন :

আহলে কোরআন নামক একটি মতবাদ ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে সূচনা হয়েছিল। তবে তাদের অনুসারী কোনোকালেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণে লক্ষ করা যায়নি। দেখা যায়নি তাদের তেমন কোনো কর্মতৎপরতা। চলমান বিশ্বে তাদের মতাদর্শে একটি নতুন বিষয় মাত্রা পেয়েছে। তাদের ধারণা মতে কোরআনের আলোকে শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ মাসের যেকোনো দিনে যার যার ইচ্ছা ও সুবিধামতো হজ আদায় করতে পারবে। ৯ই জিলহজে আরাফায় অবস্থানের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এ বিষয়ে বর্তমানে তারা ইন্টারনেট, ওয়েবসাইড ও পত্রপত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি শুরু করেছে। উলামায়ে কেরামের কাছে বিভিন্ন ধরনের চিঠিপত্র এবং প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রেরণ করে জনমত সৃষ্টির প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে। এ পরিসরে শীর্ষ পর্যায়ের একটি প্রবন্ধ আমার হস্তগত হয়েছে। প্রবন্ধটির রূপকার ও সংকলক প্রফেসর ড. আব্দুল হামিদ আবু সুলাইমান, অনুবাদ ড. আনোয়ারুল কবির, সম্পাদনা ড. আ ক ম আব্দুল কাদের। এ ছাড়া ইন্টারনেটে তারা এ বিষয়ে শত শত পৃষ্ঠা প্রতিনিয়ত লিখে চলেছে। তাদের অধিকাংশই বিভিন্ন বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়ে তারা সর্বদা জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির গবেষণায় নিয়োজিত আছেন।

উল্লিখিত মতাদর্শে তাদের আরোপিত সংশয় ও এর নিরসনের সারমর্ম পাঠকদের খেদমতে উপস্থাপন অতি জরুরি মনে করে নিম্নে অতি সংক্ষেপে কয়েক লাইন লেখার প্রয়াস পাব।

সংশয় : এক

হজের সময়সীমা বর্ণনার প্রেক্ষাপটে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

الحج أشهر معلومات

'হজের সময় হলো কয়েক মাস' [বাকারা-১৯৭]

তাদের দাবি হিসেবে কোরআনে কারীমের ভাষ্য মতে হজের সময় হলো কয়েক মাস। যথা–শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ। অতএব, শুধু ৯ই যিলহজ সবাইকে হজ আদায় করতে হবে–এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বরং উল্লিখিত তিন মাসের যেকোনো দিন যার যার সাধ্য ও সুযোগমতো হজ আদায় করতে পারবে।

নিরসন :

ক. কোরআনে কারীমে এমন অনেক বিধান রয়েছে, যা মৌলিক ও নীতিগতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা-পদ্ধতি ইত্যাদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস, আমল ও সাহাবাগণের মাধ্যমে জেনে নিতে হয়। যেমন–কোরআনে কারীমে নামায আদায় করার নির্দেশ রয়েছে। তবে এতে নামাযের পদ্ধতি এবং কোন ওয়াক্তে কত রাক'আত আদায় করবে এর কোনো বিবরণ কোরআনে নেই। কোরআনে যাকাত দিতে বলা হয়েছে। তবে যাকাতের নেসাব ও সময়ের বিবরণ কোরআনে কারীমে নেই। এসব বিস্তারিত জেনে নিতে হয় রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবাগণের মাধ্যমে। এভাবে হজের বিস্তারিত বিবরণ, পদ্ধতি এবং প্রতিটি কাজের সুনির্দিষ্ট সময়ের বর্ণনা কোরআনে সুস্পষ্ট নয়। তবে তা মানুষ পেয়েছে ইবরাহীম (আ.) এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবাগণের মাধ্যমে। যার বিস্তারিত বিবরণ ইতিমধ্যেই আমরা উপস্থাপন করেছি।

খ. সৌদি আরবের প্রখ্যাত আলেম, স্থায়ী ইফতা বোর্ডের অন্যতম সদস্য আল্লামা শায়খ সালেহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান বলেন, উল্লিখিত আয়াতে হজের দিন তথা আরাফার দিনের কোনো আলোচনা নেই। বরং এ আয়াতে হজের জন্য এহরাম বাঁধার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। আয়াতের মর্ম হলো, হজের জন্য এহরাম বাঁধার সময় হলো কয়েকটি মাস বা শাওয়াল, যিলকদ এবং যিলহজের ৯ তারিখ পর্যন্ত। যারা এ তিনটি মাসের কোনো দিনে হজের জন্য এহরাম বাঁধে তাদের এহরাম যথাযথ হবে এবং এই এহরামে হজ আদায় হবে। এ ছাড়া অন্য কোনো সময়ে, যথা কেউ যদি মুহাররম মাসে হজের জন্য এহরাম বেঁধে হজ পালন করে তাহলে তার হজ আদায় হবে না। বস্তুত এ বিষয়টির প্রতি আয়াতের উল্লিখিত অংশের পরপরই নির্দেশনাও রয়েছে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

فمن فرض فيهن الحج

'যারা এই মাসসমূহে হজ ফরয করবে।' [বাকারা-১৯৭]

তাফসীর গ্রন্থসমূহে এর অর্থ যেভাবে লিখেছে,

فمن فرض فيهن الحج يعنى فمن أوجب الحج على نفسه بالإحرام.

এই মাসসমূহে যে তার ওপর হজ ফরয করল এর অর্থ হলো যে এই মাসসমূহে হজের এহরাম বেঁধে নিজের ওপর হজ করা ওয়াজিব করেছে।

অতএব হজ কোন তারিখে হবে এর কোনো আলোচনা এই আয়াতে নেই। বরং এতে বলা হয়েছে হজের জন্য এহরাম কখন বাঁধা যাবে। এ ধরনের বক্তব্য সৌদি আরবের প্রাক্তন গ্র্যান্ড মুফতী শায়খ বিন বায থেকেও উল্লেখ আছে। বরং সমগ্র বিশ্ব মুসলিম

উলামায়ে কেরামের বক্তব্য এটাই। [ফিকহুল হাজে ওয়াল উমরা, বিন বায। তাফসীরে তাবারী ২/২৭১, ইবনে কাসীর ১/২৯৫]

সংশয় : দুই

কোরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা হজের একটি বিশেষ কারণ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন,

ويذكروا اسم الله فى أيّام معلومات

"যাতে তারা আল্লাহর নাম স্মরণ করে নির্দিষ্ট দিনসমূহে।" [হজ-২৮]

উপরোক্ত দিনসমূহ বলতে কোনো নির্দিষ্ট তারিখ বোঝানো হয়নি। বরং হজের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করতে যে দিনগুলো প্রয়োজন হয়, সেদিনগুলো বোঝানো হয়েছে। কোনো নির্দিষ্ট তারিখে ওই কাজগুলো সম্পাদন করা বাধ্যতামূলক হলে দিন-তারিখসহ নির্দিষ্ট করে বলা হতো। এ ছাড়া দিনসমূহ বর্ণনার ক্ষেত্রে যে আরবী বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে أيام معلومات তা আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী نكرة বা অনির্দিষ্ট, যা ব্যাপকতা বোঝায়। নির্দিষ্ট কোনো তারিখ বাধ্যতামূলক হলে বাক্যটি معرفه তথা নির্দিষ্ট করে উল্লেখ হতো। তাই নির্দিষ্ট কোনো তারিখে হজ করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

নিরসন :

ক. এই আয়াতের সারমর্ম এ অধ্যায়ের শুরুতেই আলোচনা করেছি। এই আয়াতের পূর্বের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ.)-কে মানুষের মধ্যে হজের জন্য ঘোষণা করার কথা উল্লেখ করেছেন। সাথে সাথে পরবর্তী এই আয়াতে বলেন, "যাতে তারা নির্দিষ্ট দিনসমূহে আল্লাহর নাম স্মরণ করে।" বর্ণনার এ পদ্ধতিতেই বোঝা যাচ্ছে ইবরাহীম (আ.) হজ পালনের ওই নির্দিষ্ট দিনগুলো আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে জ্ঞাত হয়েছেন ও ভালোভাবে তা তিনি জানতেন। এ অনুযায়ী তিনি লোকদের হজের জন্য ঘোষণা করেন এবং নিজেও এভাবেই পালন করেন। তাঁর হজ পালনের দিনগুলো ছিল ৯, ১০, ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ, যা আজ পর্যন্ত বিশ্ব মুসলিম ঐক্যবদ্ধভাবে পালন করে যাচ্ছে।

খ. নির্দিষ্ট দিনগুলোর তারিখ কোরআনে কারীমে উল্লেখ না হলেও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস, আমল এবং সাহাবাগণের অনুসৃত আমলের মাধ্যমে জানা গেছে। যার ব্যতিক্রম কোনো প্রমাণ নেই।

গ. نكره أيام معلومات বাক্যটি এখানে জানার প্রয়োজন যে نكره শব্দ বা বাক্য শুধু ব্যাপকতা বোঝানোর জন্য ব্যবহার হয় না। বরং تخصيص (নির্দিষ্ট) বোঝানোর জন্যও ব্যবহার হয়। এখানে সেই নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনেই হজ করা যাবে, তা বোঝানোর জন্যই বাক্যটিকে نكره হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

তাফসীরগ্রন্থ এবং আরবী বালাগাতের কিতাব যারা অধ্যয়ন করেছেন তারা বুঝবেন, نكره শব্দটি এ আয়াতে আরবী ব্যাকরণগতভাবে নির্দিষ্ট তারিখ বোঝানোর জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যাপকতা বোঝানোর আদৌ কোনো সুযোগ এখানে নেই। (কাওয়াইদুল ফিকহ-আমীমুল ইহসান, কুরতুবী ৩/১, দুরুসুল বালাগাত ১১৮)

সংশয় : তিন

সব মুসলমান যেদিন কুরবানী করে ওই দিনকে يوم الأضحى (আযহার দিন) বলা হয়েছে। আর হাজীগণ যে দিনে কুরবানী করবে ওই দিনকে يوم النحر (নহরের দিন) বলা হয়েছে। এতে বোঝা যায় দিন দুটি এক হওয়া জরুরি নয়। বরং জিলহজের ১০ তারিখ হলো আযহার দিন। আর হজের তিন মাসের যেদিন আরাফায় অবস্থান করবে এর পরদিনই হাজীদের জন্য নহরের দিন হিসেবে গণ্য হবে।

নিরসন :

আরবে প্রচলিত পরিভাষা, আভিধান, হাদীসগ্রন্থ এবং মুসলিম মিল্লাতের ঐকমত্যে আযহার দিন ও নহরের দিন এক ও অভিন্ন। আযহার দিনেরই অপর নাম নহরের দিন, যা ১০ই যিলহজ হিসেবে ইবরাহীম (আ.)-এর যুগ থেকে অদ্যাবধি মুতাওয়াতিরভাবে (ধারাবাহিকভাবে) আমল হয়ে আসছে। আরবী অভিধানের প্রখ্যাত সম্ভার, "লিসানুল আরবের" ভাষ্য নিম্নরূপ,

يوم النحر : عاشر ذى الحجة يوم الأضحى لأن البدن تنحر فيه

নহরের দিন হলো যিলহজের ১০ তারিখ, যা আযহার দিন হিসেবে পরিচিত। আযহার দিনকে নহরের দিন বলা হয়, কেননা ওই দিনে উট নহর করা হয়। মূলত নহর বলে উটের গলায় বিশেষ পদ্ধতিতে ছুরি চালানোকে। [লিসানুল আরব ১৪/৬৮ দেখুন, আল মুনজিদ ৪৪৭]

এ ছাড়া আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি যে ৯ই যিলহজ হলো আরাফার দিন। আর এর পরদিন হলো নহরের দিন। তাই নহরের দিন এবং আযহার দিনে কোনো ভিন্নতা নেই। আছে শুধু শাব্দিক ব্যবধান আর আধুনিক দর্শনগত পার্থক্যমাত্র।

সংশয় : চার

যিলহজের ১০, ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ হাজীদের জন্য কংকর মারার সময়। ১০ তারিখ সূর্যোদয়ের পর থেকে সূর্য হেলে যাওয়া পর্যন্ত কংকর মারা সুন্নাত। তবে অপারগতাহেতু বা অপারগদের জন্য সেদিন সুবহে সাদিকের পর থেকে ওই দিন দিবাগত রাতে সুবহে সাদিকের আগ পর্যন্ত কংকর নিক্ষেপ করার অনুমতি আছে। একইভাবে ১১, ১২

তারিখ কংকর নিক্ষেপের সুন্নাত সময় হলো সূর্য হেলার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তবে অপারগতাহেতু বা অপারগদের জন্য সূর্য হেলার পূর্বে অথবা দিবাগত রাতে সুবহে সাদিক পর্যন্ত কংকর নিক্ষেপের অনুমতি আছে। প্রশ্ন হলো, কংকর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে ভিড় ও অপারগতার প্রতি লক্ষ করে প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি সময় বৃদ্ধি করে বিশেষ সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। তাই এর ওপর কিয়াস ও অনুমান করে হজের ক্ষেত্রেও প্রচণ্ড ভিড় ও মানুষ হতাহতের বিষয়টা সামনে রেখে হজের সময়টা এক দিনে সীমাবদ্ধ না রেখে দীর্ঘমেয়াদি সময়মীমা করা যায়। যা কমপক্ষে শাওয়াল যিলকদ ও যিলহজের কয়েক দিন মিলে পূর্ণ সময়ের যেকোনো দিন হজের জন্য বিবেচনার দাবি রাখে।

নিরসন :

কংকর নিক্ষেপের সুন্নাত সময়ের আগে বা পরে কংকর নিক্ষেপের সুযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবা তাবেয়ীগণের সুস্পষ্ট উক্তি বা আমল প্রমাণ হিসেবে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত আছে। যে ভিত্তিতে এই সুযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু হজের তারিখের ক্ষেত্রে এমন কোনো সুযোগ কোনো কিতাবে নেই। নেই সাহাবা ও তাবেয়ী থেকে বর্ণিত কোনো একজনের উক্তি বা আমলের প্রমাণমাত্র। বরং ইজমা ও ঐক্য এ ধরনের সুযোগ সন্ধানের বিপরীত, যা আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। তাই হজের ক্ষেত্রে এমন সুযোগ গ্রহণের কোনো অবকাশ নেই। কংকর মারার ক্ষেত্রে অনুমতির দুটি প্রমাণ নমুনা হিসেবে নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

عن ابن عمر: أنَّ رسول الله ﷺ رخّص لرعاء الإبل أن يرُمُوا بالليل۔

ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) উট রাখালদের (অপারগদের) জন্য রাতে কংকর নিক্ষেপের অনুমতি দিয়েছেন। [মুসতাদরাক, ৩/৪২ হা. ৫৭৭২ বাযযার, নাসবুর রায়া, ৩/৮৬ সহীহ]

عن عطاء بن السائب قال: رأيت أباجعفر رمى الجمرة قبل طلوع الشمس وكان عطاء وطاوس ومجاهد والنخعي وعامر وسعيد بن جبير يرمون حين يقدمون أىّ ساعة قدموا ، لا يرون به بأسًا۔

আতা বিন সায়েব বলেন, আবু জাফরকে সূর্যোদয়ের পূর্বেই কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। আর আতা, তাউস, মুজাহিদ, নাখয়ী, আমের ও সাঈদ বিন জুবাইর (রহ.) যে সময়ে পৌঁছতেন তখনই কংকর নিক্ষেপ করতেন। এতে তারা কোনো অসুবিধা মনে করতেন না। [মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, ৪/৩৭৭ হা. ১৪৮০৪]

এ ধরনের আরো অসংখ্য প্রমাণের ভিত্তিতে কংকর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে উল্লিখিত সুযোগ গ্রহণ করা হয়। অথচ হজের ক্ষেত্রে মোটেও এমন কোনো প্রমাণ নেই। বরং আছে এর বিপরীত। তাই কংকর নিক্ষেপের এই সুযোগের ওপর অনুমান করে হজের তারিখের ক্ষেত্রে কোনো সুযোগ গ্রহণ করার উপায় নেই।

সংশয় : পাঁচ

সমসাময়িক মাসআলায় উলামায়ে কেরামের গবেষণা ও ইজতিহাদ করার অধিকার রয়েছে। এক দিনে হজ পালন করার কারণে হাজীগণ প্রচণ্ড ভিড়, হতাহত ও অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছেন। আর এ অবস্থা দিনদিন মারাত্মক হুমকির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এমতাবস্থায় হাজীদের এই দুর্ভোগ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে উলামায়ে কেরামকে গবেষণার পথে এগিয়ে আসতে হবে।

নিরসন :

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ধর্ম। কেয়ামত পর্যন্ত আগত মানবজাতির যাবতীয় বিধিবিধান ও সব সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধান এই ধর্মে রয়েছে। হ্যাঁ, সমসাময়িক বিষয়ে কোরআন-হাদীসের আলোকে যুগোপযোগী সমাধান ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পেশ করার অধিকার উলামায়ে কেরামের অবশ্যই আছে। তবে এর জন্য কিছু শর্ত শরায়েতও আছে। নিম্নে এর অন্যতম একটি শর্ত আলোচনার প্রয়াস পাব।

أن تكون هذه المسئلة غير منصوص أو مجمع عليها۔

যে বিষয়ে ইজতিহাদ গবেষণা করা হবে ওই বিষয়টি এমন হতে হবে, যাতে কোরআন-হাদীসের কোনো উদ্ধৃতি নেই। অথবা ওই বিষয়ে উলামায়ে কেরামের ইজমা (ঐকমত্য) নেই। [মাআলিমু উসূলিল ফিক্‌হ, মুহাম্মদ হুসাইন জিযানী, দারু ইবনুল জাওযী-৪৭৪]

উল্লিখিত শর্তটি ভিন্ন ভাষ্যেও বর্ণনা করা হয়েছে। তাহলো–

أن تكون المسئلة المجتهد فيها من النوازل

যে বিষয়ে ইজতিহাদ গবেষণা করা হবে ওই বিষয়টি কোরআন-হাদীসে উল্লিখিত বিষয় না হয়ে সমসাময়িক কোনো বিষয় হতে হবে। [প্রাগুক্ত]

উল্লেখ্য, ৯ যিলহজ তারিখে হজ করার বিষয়টি কোরআন-হাদীসে উল্লিখিত ও সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত একটি বিষয়। তা কোনো নিছক সমসাময়িক বিষয় নয়। তাই এ বিষয়ে কারো ইজতিহাদ ও গবেষণার কোনো সুযোগ ইসলামী শরীয়তে আদৌ নেই।

ইসলামী অর্থনীতি

মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-১৯

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

মুদ্রার মধ্যে পরিবর্তনের দ্বিতীয় প্রকারের ব্যাখ্যা

كساد মুদ্রার ব্যবহার ছেড়ে দেওয়া বা চাহিদা হ্রাস পাওয়া (Depression)

এই অর্থে ও ফুকাহায়ে কেরাম বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে থকেন। যথা,

ابطال قطع التعامل ترك التعامل كساد (Depression)

শাব্দিক অর্থ চাহিদা হ্রাস পাওয়া পরিভাষায় (Depression) এর সজ্ঞা দিতে গিয়ে আল্লামা ইবনে আবেদীন (রহ.) লিখেন,

والكساد ان تترك المعاملة بها فى جميع البلاد (رد المحتار ٧ / ٤١)

অর্থাৎ كساد বলা হয় পুরো শহরে মুদ্রার ব্যবহার ছেড়ে দেওয়াকে। পূর্বে আলোচিত انقطاع মুদ্রার প্রচলন বন্ধ হয়ে যাওয়া বা (Forfeture ও كساد মুদ্রার ব্যবহার ছেড়ে দেওয়া বা হ্রাস পাওয়া (Depression) এর মধ্যে অর্থগতভাবে পার্থক্য হলো انقطاع বা মুদ্রার প্রচলন বন্ধ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মুদ্রা বিলুপ্ত হয়ে যায়; কিন্তু كساد বা ব্যবহার ছেড়ে দেওয়া এবং হ্রাস পাওয়ার ক্ষেত্রে মুদ্রা বিলুপ্ত হয় না বরং মুদ্রার অস্তিত্ব বহাল থাকে; কিন্তু জনসাধারণ এর ব্যবহার ছেড়ে দেয়, এমনকি এর ফলে প্রথাগত মুদ্রার ছমনিয়্যাত শেষ হয়ে যায় এবং তা সাধারণ পণ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। হানাফী ফকীহদের নিকট পূর্বোক্ত মুদ্রার অবস্থাদ্বয়ের মধ্যে বিধানগত কোনো পার্থক্য নেই। যথা–

(১) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, যদি সমস্ত শহরে মুদ্রার ব্যবহার ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে কৃত মু'আমালা ফাসিদ হয়ে যাবে। তবে কিছু কিছু শহরের মধ্যে যদি ব্যবহার বহাল থাকে তাহলে এমতাবস্থায় কিছু কিছু বক্তব্য দ্বারা বোঝা যায় মু'আমালা ফাসিদ হয়ে যাবে। আবার কিছু কিছু বক্তব্য দ্বারা বোঝা যায় মু'আমালা ফাসিদ হবে না। বাঈ (ক্রয়-বিক্রয়) ফাসিদ হয়ে গেলে বিক্রীত পণ্য যদি বহাল থাকে তা ক্রেতা-বিক্রেতার নিকট উক্ত ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত দিয়ে দেবে। যদি বিক্রীত পণ্য বহাল না থাকে তাহলে উক্ত পণ্য যদি অনুরূপীয় হয় অর্থাৎ পাথর ও পাত্র দ্বারা পরিমাপ যোগ্য হয় এমতাবস্থায় উক্ত পণ্যের অনুরূপ পণ্য বিক্রেতার নিকট ফেরত দিতে হবে, অন্যথাই এর মূল্য ফেরত দিতে হবে। কিন্তু মু'আমালাটা যদি ক্রয়-বিক্রয়ের না হয়ে ঋণের হয় অথবা স্ত্রীর মোহরের মু'আমালা হয় তাহলে ওই মুদ্রাই ফেরত দিতে হবে যদিও এর প্রচলন ও ব্যবহার হ্রাস পায়।

(২) ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, এমতাবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় (বাঈ) ফাসিদ হবে না তবে মু'আমালা ভেঙে দেওয়ার এখতিয়ার বিক্রেতার থাকবে। যদি ভেঙে না দেয় তাহলে ক্রেতার ওপর উক্ত পণ্যের মূল্য আদায় করা ওয়াজিব হবে। তবে মূল্য নির্ধারণ বিষয়ে উপরোক্ত ইমামদ্বয়ের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

(ক) ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে, (আকদ) চুক্তির সময়ের মূল্য ধর্তব্য হবে (খ) ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, মুদ্রার প্রচলন ছেড়ে দেওয়ার দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে। এ ক্ষেত্রেও বিশুদ্ধ ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মত।

উপরোক্ত ব্যাখ্যাদ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেল যে হানাফী ফকীহদের মতে انقطاع তথা মুদ্রার প্রচলন বন্ধ হয়ে যাওয়া ও كساد তথা মুদ্রার ব্যবহার ছেড়ে দেওয়া উভয় ধরনের পরিবর্তনের মধ্যে বিধানগত কোনো পার্থক্য নেই। এ বিষয়ে আল্লামা শামী (রহ.) লেখেন,

والانقطاع عن ايدى الناس كالكساد (رد المحتار ٧/٤١)

তিনি আরো লেখেন–

والانقطاع كالكساد (المرجع السابق)

উভয় বক্তব্যের মর্মার্থ হলো, মুদ্রার প্রচলন বন্ধ হয়ে যাওয়া ও ব্যবহার ছেড়ে দেওয়া সমপর্যায়ের ও সমার্থক। মুদ্রার ব্যবহার ছেড়ে দেওয়া ও ব্যবহার হ্রাস পাওয়া বিষয়ে বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ আল্লামা কাসানী (রহ.) লেখেন–

ولو اشترى بفلوس نافقة ثم كسدت قبل القبض انفسخ عند ابى حنيفة وعلى المشترى رد المبيع ان كان قائما وقيمته او مثله ان كان هالكا، وعند ابى يوسف ومحمد رحمهما الله لا يبطل البيع والبائع بالخيار ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ قيمة الفلوس

وحجة ابى حنيفة : ان الفلوس بالكساد خرجت عن كونها ثمنا لان ثمنيتها ثبتت باصطلاح الناس فاذا ترك الناس التعامل بها عددا فقد زال عنها صفة الثمنية ولا بيع بلا ثمن فينفسخ ضرورة۔

وحجة ابى يوسفؒ ومحمدؒ اولا : ان الفلوس فى الذمة وما فى الذمة لا يحتمل الهلاك فلا يكون الكساد هلاكا بل يكون عيبا فيما يوجب الخيار ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ قيمة الفلوس۔

وثانيا: ان الواجب بقبض القرض رد

مثل المقبوض وبالكساد عجز عن رد المثل لخروجها عن الثمنية وصيرورتها سلعة، فيجب عليه قيمتها كما لو استقرض شيئا من ذوات الامثال وقبضه ثم انقطع عن ايدى الناس۔

ثم اختلف ابو يوسف ومحمدؒ فيما بينهما فى وقت اعتبار القيمة فاعتبر ابو يوسف وقت العقد لانه وقت وجوب الثمن، واعتبر محمد وقت الكساد وهو آخر يوم ترك الناس التعامل بها لانه وقت العجز عن التسليم، ولو استقرض فلوسانافقة وقبضها فكسدت فعليه رد مثل ما قبض من الفلوس عددا فى قول ابى حنيفة وابى يوسفؒ وفى قول محمد عليه قيمتها (بدائع الصنائع ٧/٢٤٥)

অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি কোনো বস্তু বা পণ্য এমন পয়সা দ্বারা ক্রয় করল, যার প্রচলন ছিল। কিন্তু বিক্রেতা উক্ত পয়সা কব্জ করার পূর্বেই উক্ত পয়সার লেনদেন জনসাধারণ ছেড়ে দিল। এমতাবস্থায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যাবে। ক্রেতার জন্য ক্রয়কৃত পণ্য বিক্রেতার নিকট ফেরত দেওয়া জরুরি হবে, যদি উক্ত পণ্য বহাল থাকে। অথবা এর অনুরূপ পণ্য ফেরত দিতে হবে, যদি বিক্রীত পণ্য ধ্বংস হয়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়। ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, উপরোক্ত ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হবে না। বরং বিক্রেতার এখতিয়ার থাকবে সে যদি (আকদ) চুক্তি ভেঙে দিতে চায় তাও পারবে অথবা চুক্তি বহাল রেখে পয়সার মূল্য নিয়ে নেবে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর দলিল হলো, পয়সার ব্যবহার জনসাধারণ ছেড়ে দেওয়ার ফলে ছমন হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে এবং ক্রয়-বিক্রয় 'ছমন' ছাড়া হয় না বিধায় উপরোক্ত ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে।

ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর প্রথম দলিল হলো, এই যে পয়সা ক্রেতার জিম্মায় আদায় করা ওয়াজিব এবং যা কারো জিম্মায় ওয়াজিব হয় তা কখনো ধ্বংস হয় না। সুতরাং পয়সার প্রচলন হ্রাস পাওয়া বা ব্যবহার ছেড়ে দেওয়া ধ্বংস হওয়া নয় বরং দোষ। যার ফলে বিক্রেতার এখতিয়ার থাকবে ইচ্ছা করলে চুক্তি ভেঙেও দিতে পারবে অথবা পয়সার মূল্য ক্রেতা থেকে নিয়ে নিতে পারবে।

দ্বিতীয় দলিল, ঋণ কব্জ করা দ্বারা এর অনুরূপ আদায় করা ওয়াজিব হয় এবং মুদ্রার ব্যবহার ছেড়ে দেওয়ার ফলে ঋণগ্রহীতা ঋণের অনুরূপ আদায় করা থেকে অপারগ হয়ে গেল, কেননা সে যেই পয়সা ঋণ হিসেবে নিয়েছিল, তা এখন আর 'ছমন' নাই বরং পণ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে তাই ঋণগ্রহীতার ওপর উক্ত পয়সার মূল্য আদায় করা ওয়াজিব হবে। যথা কোনো ব্যক্তি অনুরূপীয় কোনো পণ্য বা বস্তু কারো কাছ থেকে ঋণ/কর্জ নিল এবং এর ওপর কব্জ ও করল পরবর্তীতে উক্ত অনুরূপীয় পণ্যের প্রচলন বন্ধ হয়ে গেল। তবে কোন সময়ের মূল্য ধর্তব্য হবে তা নিয়ে ইমামদ্বয়ের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে (আকদ) চুক্তির সময়ের মূল্য ধর্তব্য হবে। কেননা উক্ত সময়টাই ক্রেতার ওপর ছমন ওয়াজিব হওয়ার সময়। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, প্রচলন বন্ধ হয়ে যাওয়ার সময়ের মূল্য ধর্তব্য হবে। কেননা পয়সা বিক্রেতাকে পরিশোধ করা থেকে অপারগ হওয়ার সময় এটাই। যদি প্রচলিত পয়সা কোনো ব্যক্তি ঋণ হিসেবে নিয়ে থাকে পরবর্তীতে জনসাধারণ এর ব্যবহার পরিত্যাগ করে তাহলে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে ঋণগ্রহীতার ওপর কব্জকৃত পয়সার অনুরূপ পয়সা আদায় করা জরুরি হবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, এমতাবস্থায় পয়সার মূল্য পরিশোধ করা ঋণগ্রহীতার ওপর জরুরি হবে। এ বিষয়ে রদ্দুল মুহতার এবং ফতাওয়া হিন্দিয়াতে উল্লিখিত আলোচনার সারসংক্ষেপ নিম্নে পেশ করা হলো।

যদি কোনো ব্যক্তি ওই সব দিরহাম দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় করল যাতে খাদের পরিমাণ বেশি। অথবা এমন পয়সা দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় করল যেগুলোতে খাদের পরিমাণ বেশি এবং বিক্রেতাকে ছমন (Price) পরিশোধ করার পূর্বেই উক্ত দিরহাম ও পয়সার প্রচলন বন্ধ হয়ে যায় অথবা জনসাধারণ এর ব্যবহার ছেড়ে দেয় তাহলে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় লেনদেন বাতিল হয়ে যাবে। মুদ্রার প্রচলন বন্ধ বা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া এবং জনসাধারণ এর ব্যবহার ছেড়ে দেওয়া বা হ্রাস পাওয়া মুদ্রার মধ্যে উভয় ধরনের পরিবর্তন বিধানগতভাবে একই ধরনের। এমতাবস্থায় যদি বিক্রীত পণ্য বহাল থাকে তাহলে তা বিক্রেতার নিকট ফেরত দেওয়া ক্রেতার ওপর ওয়াজিব হবে। যদি বিক্রীত পণ্য বহাল না থাকে এমতাস্থায় উক্ত পণ্য যদি অনুরূপীয় হয় তাহলে অনুরূপ অন্য একটি পণ্য পাওয়া না যায় তাহলে মূল্য ফেরত দিতে হবে। যদি বিক্রীত পণ্য ক্রেতার কবজায় না থাকে অর্থাৎ ক্রেতা ক্রয়কৃত পণ্যের ওপর কব্জ না করে তাহলে কিছুই ফেরত দিতে হবে না। উপরোক্ত বক্তব্য ইমাম আজম ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, উক্ত অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হবে না। কেননা এখানে বেশি থেকে বেশি এটাই হয়েছে যে, মুদ্রার ব্যবহার ছেড়ে দেওয়ার ফলে ক্রেতা তা হস্তান্তর করতে অক্ষম। কিন্তু দ্বিতীয়বার প্রচলন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়ে যাওয়ার ফলে সে পুনরায় সক্ষমও হতে পারে। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হবে না। তবে ইমাম আবু

ইউসুফ (রহ.)-এর মতে, ক্রয়-বিক্রয়ের দিনের মূল্য ওয়াজিব হবে এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, প্রচলন বন্ধ বা ব্যবহার ছেড়ে দেওয়ার দিনের মূল্য ওয়াজিব হবে। যখীরা গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে ফতাওয়া ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতের ওপর। মুহিত, তাতিম্মাহ এবং হাকায়েক ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে জনসাধারণের সুবিধার্থে ফাতওয়া ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতের ওপর হবে। (রদ্দুল মুহতার খণ্ড-৭, পৃ. ৪১ ফাতওয়া হিন্দিয়া খণ্ড-৩, পৃ. ২২৫)

পূর্বোক্ত বিধান হলো ক্রয়-বিক্রয়ের। যদি ঋণের লেনদেন হয় এবং মুদ্রার ব্যবহার হ্রাস পায় বা জনসাধারণ এর ব্যবহার ছেড়ে দেয় তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে তখন ঋণের অনুরূপ আদায় করতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে মূল্য ফেরত দেওয়া জরুরি। তবে মূল্য কোন সময়ের নির্ধারণ করা হবে তা নিয়ে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আলোচ্য মতপার্থক্য এ পর্যায়েও বিদ্যমান। একটি বক্তব্য অনুসারে ঋণের মাসআলায় ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাথে যেমনটা বদায়ে গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের শেষে উল্লেখ রয়েছে।

সারমর্ম হলো, মুদ্রার প্রচলন বন্ধ হয়ে যাক অথবা হ্রাস পাক উভয় অবস্থায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে এর ফলে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সয়ংক্রিয়ভাবে ভেঙে যাবে। এমতাবস্থায় ক্রেতার ওপর ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত দেওয়া ওয়াজিব হবে। যদি ক্রয়কৃত পণ্য বহাল না থাকে তাহলে উক্ত পণ্য অনুরূপীয় হলে তার অনুরূপ ফেরত দিতে হবে, যদি অনুরূপীয় না হয় তাহলে এর মূল্য ফেরত দেওয়া ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, উপরোক্ত অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বাতিলও হবে না ফাসিদও হবে না। বরং এটা একটি দোষ মাত্র, যার ফলে বিক্রেতার জন্য উক্ত চুক্তি ভেঙে দেওয়ার এখতিয়ার হাসিল হবে। যদি সে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি ভেঙে দেয় তাহলে বিক্রীত পণ্য ফেরত দেওয়া বিষয়ে পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা অনুসারেই হবে, যা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত। যদি বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি ভেঙে না দেয় বরং বহাল রাখে তাহলে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় বহাল থাকবে এবং ক্রেতার দায়িত্বে পূর্বনির্ধারিত ছমন (Price)-এর মূল্য পরিশোধ করতে হবে এবং তা ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে চুক্তির দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে মুদ্রার প্রচলন বন্ধ হয়ে যাওয়া বা হ্রাস পাওয়ার দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে। উভয় অবস্থায় হানাফী মাযহাবে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতের ওপর ফাতওয়া দেওয়া হয়।

মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাব

এ বিষয়ে তাদের মতামত হলো যখন মুদ্রার ব্যবহার জনসাধারণ ছেড়ে দেয় বা হ্রাস পায় তখন ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বাতিল হয় না বরং ক্রেতা ওই মুদ্রাই বিক্রেতাকে হস্তান্তর করবে, যা চুক্তির সময় প্রচলিত ছিল। তবে শাফেয়ী মাযহাবের একটা মত অনুসারে এমতাবস্থায় বিক্রেতার এখতিয়ার থাকবে সে ইচ্ছা করলে পুরাতন মুদ্রা গ্রহণ করবে, না হয় চুক্তি ভেঙে দেবে। যেমনটা উল্লেখ রয়েছে যরকানী গ্রন্থের ব্যাখ্যায়,

وان بطل فلوس ترتبت لشخص على آخر اى قطع التعامل بها بالكلية فالمثل على من ترتبت فى ذمته قبل قطع التعامل بها (شرح الزرقانى على خليل ٥/٦٠)

অর্থাৎ যদি ওই পয়সা যা কারো জিম্মায় ওয়াজিব ছিল তার ব্যবহার জনসাধারণ ছেড়ে দেয় অর্থাৎ এর সাথে লেনদেন সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে যার জিম্মায়/দায়িত্বে উক্ত পয়সা আদায় করা ওয়াজিব ছিল। সে উক্ত পয়সার অনুরূপ আদায় করবে, যা প্রচলন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পূর্বে প্রচলিত ছিল।

দাসূকী গ্রন্থের ব্যাখ্যায় উল্লেখ রয়েছে।

ان بطلت فلوس او دنانير او دراهم ترتبت لشخص على غيره فقطع التعامل بها، ومن باب اولى اذا تغيرت بزيادة او نقص، فيجب قضاء المثل على من ترتبت فى ذمته قبل قطع التعامل بها او تغيرها (حاشية الدسوقى ١/ ٥٤)

অর্থাৎ যদি ওই সব পয়সা, দিরহাম, দিনার বাতিল হয়ে যায়, যা কোনো ব্যক্তির ওপর আদায় করা ওয়াজিব ছিল, পরবর্তীতে ওইগুলোর ব্যবহার ছেড়ে দেয় তাহলে যার জিম্মায়/দায়িত্বে ওয়াজিব ছিল তার ওপর ওই মুদ্রার অনুরূপ আদায় করা ওয়াজিব হবে, যা এর পূর্বে প্রচলিত ছিল। তদ্রূপ মানহুল জলীল ও আল মি'য়ারুল মু'রাব গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে–

ومن ابتاع او اقترضه ثم بطل التعامل به لم يكن عليه غيره، منح الجليل

وافتى ابو الوليد الباجى انه لا يلزمه الا السكة الجارية حين العقد (المعيار المعرب ٦/١٦٤)

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি এমন কোনো মুদ্রা দ্বারা ক্রয় করল বা এমন মুদ্রা ঋণ হিসেবে গ্রহণ করল পরবর্তীতে যার ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেছে, তাহলে এর ওপর ওই মুদ্রাই আদায় করা জরুরি হবে, অন্য কিছু নয়। আল্লামা আবুল ওয়ালিদ বাজী (রহ.)-এর ফাতওয়া হলো, ঋণগ্রহীতার ওপর ওই মুদ্রাই আদায় করা ওয়াজিব, যা আকদ করার সময় প্রচলিত ছিল। শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব 'আল মাজমূ' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে–

ولو باع بنقد معين او مطلق وحملناه على نقد البلد فابطل السلطان المعاملة بذلك النقد لم يكن للبائع الا ذلك النقد هذا هو المذهب (المجموع

(৩৩১/৭)

অর্থাৎ যদি কোনো নির্ধারিত মুদ্রা বা সাধারণ মুদ্রা দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় করল এবং সেটাকে আমরা দেশে প্রচলিত মুদ্রাই ধরে নিলাম এমতাবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান উক্ত মুদ্রার লেনদেন বাতিল করে দিলেন। তাহলে বিক্রেতা ওই মুদ্রাই পাবে, যা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির সময় প্রচলিত ছিল।

রওজাতুততালেবীন গ্রন্থে আল্লামা নববী (রহ.) লেখেন,

ولو قرضه نقدا فابطل السلطان المعاملة بـه فـليـس له الا النقد الذى اقرضه نص عليه الشافعىؒ (روضة الطالبين ٣٧/٤)

অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে মুদ্রা ঋণ দিল পরবর্তীতে রাষ্ট্রপ্রধান উক্ত মুদ্রার ব্যবহার বাতিল করে দিলেন এমতাবস্থায় ঋণদাতা ওই মুদ্রাই পাবে, যা সে ঋণ হিসেবে দিয়েছিল। যার বর্ণনা ইমাম শাফেয়ী (রহ.) সুস্পষ্টভাবে করেছেন। আল্লামা নববী 'আল মাজমূ' গ্রন্থে আরো লেখেন,

وحـكى البغوى والرافعى ان البائع مخير ان شـاء اجـاز البيع بذلك النقد وان شاء فسخه (المجموع ٢٨٢/٩)

অর্থাৎ ইমাম বগভী ও ইমাম রাফেয়ী আরো একটি পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন তা হলো এমতাবস্থায় বিক্রেতার এখতিয়ার থাকবে, সে যদি উক্ত মুদ্রা দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বাস্তবায়ন করে তাও পারবে, আবার ইচ্ছা করলে চুক্তি ভেঙেও দিতে পারবে।

উপরোক্ত বক্তব্যগুলোর সারমর্ম, মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাবের প্রাধান্যপ্রাপ্ত বক্তব্য ও ফাতওয়া হলো, মুদ্রার ব্যবহার জনসাধারণ ছেড়ে দিলে পাওনাদার ওই মুদ্রাই নেবে, যা আকদের সময় প্রচলিত ছিল। যদিও ওই মুদ্রার ব্যবহার না থাকে। উক্ত চুক্তি ক্রয়-বিক্রয়ের হোক বা ঋণের। উক্ত বক্তব্য দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেল যে মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাবে انـقـطـاع তথা মুদ্রার বিলুপ্তি ও كساد তথা মুদ্রার ব্যবহার ছেড়ে দেওয়া উভয়টার মধ্যে বিধানগতভাবে পার্থক্য রয়েছে।

হাম্বলী মাযহাব

كساد তথা মুদ্রার ব্যবহার ছেড়ে দেওয়া বা হ্রাস পাওয়া অবস্থায় হাম্বলী মাযহাব মতেও মূল্য ফেরত দেওয়া জরুরি। তবে মূল্য নির্ধারণ বিষয়ে তাদের তিনটি মত রয়েছে।

(১) ব্যবহার ছেড়ে দেওয়ার সময়ের মূল্য ধর্তব্য হবে। যেমনটা হানাফীদের মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মত। এই মতটা হাম্বলী মাযহাবের প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত।

(২) লেনদেন চুক্তির সময়ের মূল্য ধর্তব্য হবে। যেমনটা হানাফীদের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মত।

(৩) চুক্তিকারীদ্বয়ের বিবাদের সময়ের মূল্য ধর্তব্য হবে।

আল্লামা ইবনে কুদামাহ (রহ.) লেখেন–

ان كـان الـقـرض فـلـوسـا او مكسرة فـحرمها السلطان وتركت المعاملة بها لانـه كالعيب فلا يلزمه قبولها ويكون له قيمتها وقت القرض سواء كانت باقية او استهـلكها نص عليه احمد فى الدراهم الـمـكسرة فقال يقومها كم تساوى يوم اخـذها ثم يعطيه ، وسواء نقصت قيمتها قليلا او كثيرا

وذكـر ابـو بـكـر فـى التنبيه انه يكون له قيـمتهـا وقت فسدت وتركت المعاملة بها لانه كان يلزمه مثلها مادامت نافقة، فـاذا فسدت انتقل الى قيمتها حينئذ كم لو عدم المثل (المغنى ٣٦٥/٤)

অর্থাৎ যদি ঋণ পয়সা অথবা ভাঙা দিরহাম হয় এবং পরবর্তীতে রাষ্ট্রপ্রধান ওইগুলোর ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেওয়ার ফলে জনসাধরণ ওই পয়সাও ভাঙা দিরহামের ব্যবহার ছেড়ে দেয় তাহলে এটা দোষের মতো। সুতরাং পাওনাদারের জরুরি নয় যে, ওই পয়সা ও ভাঙা মুদ্রা গ্রহণ করা, যার ব্যবহার জনসাধারণ ছেড়ে দিয়েছে বরং ঋণগ্রহীতার ওপর এর মূল্য আদায় করা ওয়াজিব হবে। যাতে ঋণ গ্রহণের সময়ের মূল্য ধর্তব্য হবে। উক্ত মুদ্রা ঋণগ্রহীতার নিকট বহাল থাকলে ও ব্যয় করে ফেললেও। ইমাম আহমদ (রহ.) ভাঙা দিরহাম বিষয়ে এই মতটাই স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে এ ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহণের দিনের মূল্যই ধর্তব্য হবে। তাই ওই মূল্যই ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে পরিশোধ করবে। এর মূল্য যাই হোক কম বা বেশি। আবু বকর (রহ.) তানবীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, যেই দিন মুদ্রার ব্যবহার জনসাধারণ ছেড়ে দিয়েছে ওই দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে। কেননা মুদ্রার প্রচলন থাকা অবস্থায় এর ওপর যা গ্রহণ করেছিল তার অনুরূপ আদায় করা ওয়াজিব ছিল। সুতরাং মুদ্রার ব্যবহার যখন ছেড়ে দিয়েছে তাহলে এর মূল্য আদায় করতে হবে। যেমনটা কোনো অনুরূপীয় বস্তু বিলুপ্ত হয়ে গেলে এর মূল্য আদায় করতে হয়। আল্লামা বহুতী 'কাশফুল কানা' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে,

ان كـان الـقـرض فـلـوسـا او دراهـم مـكسـورة فيحرمها اى يمنع الناس من الـمعاملة بها السلطان او نائبه سواء اتفق الـناس على ترك المعاملة بها او لا، لانه كـالـعيـب فـلا يلزمه قبولها فللمقترض الـقيـمة عن الفلوس والمكسرة فى هذه الـحـال وقـت الـقـرض (كشف القناع ٣٠١/٣)

আল্লামা মিরদাভী (রহ.) আল ইনসাফ গ্রন্থে লেখেন,

ان كـان فـلـوسـا او مـكسـرة فيحرمها السـلـطـان الصحيح من المذهب ان له الـقيـمة سواء اتفق الناس على تركها او لا وعـليه اكثر الاصحاب وجزم به كثير مـنهـم ـــ وقال فى المستوعب وهو الـصـحيح عندى ـــ وقيل له القيمة وقت الخصومة ـ (الانصاف ١٢٧/٥)

এই বক্তব্যগুলোর মর্মার্থও আল্লামা ইবনে কুদামাহ (রহ.)-এর বক্তব্যের মতোই

তবে এতে চুক্তিকারীদ্বয়ের বিভেদের কথা উল্লেখ রয়েছে।

সারসংক্ষেপ

পূর্বোক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ হলো كساد তথা মুদ্রার বিলুপ্তি হোক বা انقطاع তথা মুদ্রার ব্যবহার জনসাধরণ ছেড়ে দিক উভয় অবস্থায় ইমাম আজম ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি ভেঙে যাবে এবং ক্রেতার ওপর ক্রয়কৃত পণ্য অথবা এর অনুরূপ অথবা এর মূল্য ফেরত দেওয়া জরুরি হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) ও জমহুর উলামায়ে কেরামের মতে, উপরোক্ত অবস্থাদ্বয়ের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি ভেঙে যাবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে, উভয় অবস্থায় চুক্তির দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, বিলুপ্তির দিন বা ব্যবহার ছেড়ে দেওয়ার দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতের ওপর ফাতওয়া। সুতরাং হানাফী মাযহাব মতে মুদ্রার বিলুপ্তি এবং ব্যবহার ছেড়ে দেওয়া উভয় অবস্থার মধ্যে বিধানগত কোনো পার্থক্য নেই। অপরদিকে অন্য ইমামত্রয়ের নিকট উপরোক্ত অবস্থাদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যথা–মালেকী মাযহাব মতে, মুদ্রার বিলুপ্তি ঘটলে সমাধানের দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে এবং মুদ্রার ব্যবহার ছেড়ে দেওয়া অবস্থায় উক্ত মুদ্রাই ফেরত দিতে হবে, যার ওপর চুক্তি হয়েছিল এবং চুক্তির সময় প্রচলিত ছিল। শাফেয়ী মাযহাব মতে, মুদ্রা বিলুপ্তির অবস্থায় পাওনাদারের চাহিদার দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে এবং মুদ্রার ব্যবহার ছেড়ে দেওয়া অবস্থায় উক্ত মুদ্রাই ফেরত দিতে হবে, যা চুক্তির সময় প্রচলিত ছিল। হাম্বলী মাযহাব মতে, মুদ্রা বিলুপ্ত হয়ে গেলে বিলুপ্তির দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে। তবে জনসাধারণ মুদ্রার ব্যবহার ছেড়ে দিলে এ বিষয়ে তাদের তিনটি মতের মধ্যে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো ব্যবহার ছেড়ে দেওয়ার দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে। উপরোক্ত ব্যাখ্যা ঋণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে ঋণের মধ্যে তার অনুরূপ আদায় করা ওয়াজিব হবে। পূর্বোক্ত উভয় অবস্থায়।

উল্লেখ্য, যদি কোনো দেশে ওই দেশের মুদ্রার মান এমনভাবে পতন হয়ে যায় যে, সেটাকে ব্যবহার ছেড়ে দেওয়াই বলা যায়। তাহলে সেখানে করজ এবং ঋণের ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ বা ইমাম আবু ইউসুফের মতের ওপর আমল করার অবকাশ থাকবে। বিশেষ করে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতের ওপর আমল করা সহজ। কেননা যে সময় লেনদেন হচ্ছিল, ওই সময় মুদ্রার বাস্তব মূল্য কত ছিল ওই হিসাবে পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করবে।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০	১০০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১১৮০	১৩০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১৩০০	১৫০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৬০০	১৮০০
#	আমেরিকা	১৮০০	২১০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :

শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪

নবীজি (সা.)-এর হজ :
(কিছু শিক্ষণীয় বিষয়)

মুফতী শরীফুল আজম

অন্তরে আল্লাহর মহব্বত ধারণ :

মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান পাওয়ার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলার মহব্বত ও ভালোবাসা। দুনিয়ার বৈধ জিনিসের মায়া-মহব্বত যদিও বৈধ; কিন্তু তা মনের অতল গভীরে জায়গা পাওয়ার যোগ্য নয়। সব কিছুর মায়া-মহব্বতের ওপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত প্রবল না হওয়া পর্যন্ত মানুষ পূর্ণাঙ্গ মু'মিন হতে পারে না। আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন, "এবং যারা ঈমান এনেছে, তাদের অন্তরে আল্লাহর মহব্বত অত্যন্ত প্রবল।" (সূরা বাকারা ১৬৫) নবীজি (সা.) নিজেও এই দু'আ করেছেন। আর উম্মতকেও শিক্ষা দিয়ে গেছেন "হে আল্লাহ! আপনার মহব্বতকে আমার অন্তরে আমার জানমাল, পরিবার-পরিজন এবং ঠাণ্ডা পানি অপেক্ষা প্রবল ও সর্বাধিক প্রিয় বানিয়ে দিন।"

অর্থাৎ তৃষ্ণাতের নিকট ঠাণ্ডা পানি যত প্রিয়, আপনার মহব্বত ও ভালোবাসা আমার প্রাণে ততধিক প্রিয় ও প্রবলতর করে দিন। জানমাল, বিবি-বাচ্চা সব কিছুই আমার নিকট প্রিয় বটে, কিন্তু হে মাওলা! হৃদয়-মনে আপনাকে আমি এর চেয়ে বেশি প্রিয় বানাতে চাই।

সাহাবায়ে কেরামের মাঝে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) হুজুর (সা.)-এর সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিলেন। ইসলাম প্রচারের শুরুলগ্ন থেকেই নবীজি (সা.)-এর সাথে তাঁর মহব্বতের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অসংখ্য হাদীসে আবু বকর (রা.)-এর এই ফজীলত বর্ণিত হয়েছে। এত প্রিয় সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও নবীজি (সা.) ইরশাদ করেন, "যদি আমি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাতাম তবে আবু বকরকেই বানাতাম। জেনে রাখো, তোমাদের এই সাথী (অর্থাৎ আমি) আল্লাহর অন্তরঙ্গ বন্ধু।"(তিরমিযী হা. ৩৬৬)

অর্থাৎ অন্তরের গভীরে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে স্থান দিয়ে রেখেছি। আবু বকর যদিও আমার প্রিয়; কিন্তু তবুও সে স্থানে তার জায়গা নেই।

নবীজি (সা.)-এর হৃদয়ে মাওলার মহব্বত-ভালোবাসা পার্থিব সকল মায়া-মমতার ওপর ছিল প্রবল। তাওহীদে খালেসের এই শিক্ষাই তিনি উম্মতকে দিয়ে গেছেন। তাই প্রতিটি মু'মিনের হৃদয়ে আল্লাহর মহব্বত এমন প্রবল হওয়া একান্ত জরুরি। আর তা শুধুই নিজের আখেরাতের মুক্তির স্বার্থে। মাওলার মহব্বতের চেয়ে যদি পার্থিব জানমালের মহব্বত বেশি হয় তবে এসবের স্বার্থ রক্ষার্থে বান্দা আল্লাহর নাফরমানী করে বসবে, ফলে আখেরাত বরবাদ হবে। আর যদি মাওলার মহব্বত প্রবল হয় তবে সব কিছু পেছনে ফেলে সকলকে নারাজ করে হলেও একমাত্র মাওলাকে সন্তুষ্ট করার পথ অবলম্বন করবে। ফলে তার আখেরাতের জীবন হবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় চিরস্থায়ী নেয়ামতরাজি দ্বারা সজ্জিত।

পবিত্র হজের শিক্ষা :

হজ এমন একটি ইবাদত, যাতে বান্দাকে মাওলার মহব্বতের কথা ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। হজের প্রতিটি বিধিবিধানের মাঝে রয়েছে তাওহীদের দাওয়াত ও শিরিক পরিহারের আহ্বান। মুশরিকদের আচার-আচরণের বিপরীত বহু বিধিবিধান প্রবর্তন করা হয়েছে হজের মাঝে। গাইরুল্লাহর মহব্বত অন্তর থেকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে মাওলার মহব্বত অন্তরে পুরে দিতে রাখা হয়েছে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা। বেশ-ভূষণ চয়নের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। কাফনসাদৃশ্য ইহরামের লেবাস গায়ে জড়িয়ে বান্দা যখন লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক..... ধ্বনি উচ্চারণ করে ঘর থেকে বের হয়, পিছুটান বলতে তখন আর কিছু বাকি থাকে না। সকল মায়াজাল ছিন্ন হয়ে যায়। পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, মাল-দৌলত কোনো কিছুর মহব্বতই আর তখন বান্দাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। শুধু আর শুধুই মাওলার মহব্বত তখন বান্দাকে পাগলপারা করে তোলে। স্থাপিত হয় মাওলার সাথে বান্দার বিশেষ সম্পর্ক। পবিত্র কোরআনের নির্দেশও তাই এমনই দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

"তোমরা হজ ও উমরা আল্লাহর জন্য সম্পন্ন করো।"(বাকারা ১১৬) অর্থাৎ হজের মাঝে ঐকান্তিকতার তাগিদ করা হয়েছে। একমাত্র আল্লাহকে আপন করে নেওয়ার জন্যই যেন এই হজের আয়োজন।

হাদীসে পাকেও এমন উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, নবীজি (সা.) ইরশাদ করেন, "কঙ্কর নিক্ষেপ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈর বিধান প্রবর্তন করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠিত করা।" (মিশকাত-২৩১)

অর্থাৎ অন্তর রাজ্যে আল্লাহর স্মরণ

জাগিয়ে তোলা সার্বক্ষণিক তার যিকির-ফিকিরে মত্ত থাকার প্রশিক্ষণস্বরূপ এ সকল বিধান দেওয়া হয়েছে।

হজের প্রতিটি হুকুম-আহকামের প্রতি লক্ষ করলে এই একটি বিষয়ই ফুটে ওঠে। অর্থাৎ তাওহীদ ও মাওলার মহব্বতের চর্চা এবং শিরিক ও সকল গাইরুল্লাহর মহব্বত থেকে মুক্ত হওয়ার প্রশিক্ষণ। নমুনাস্বরূপ কয়েকটি বিধান নিয়ে আলোচনা করা হলো।

১. তালবিয়া :

তালবিয়া হচ্ছে হজের স্লোগান। এতে ঘোষণা করা হয়েছে যে বান্দার ইবাদত-বন্দেগী, জীবন-মরণ–সবই একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত। গাইরুল্লাহকে পরিপূর্ণ ত্যাগ করে একমাত্র মাওলার মহব্বত বক্ষে ধারণ করে দয়াময়ের দুয়ারে হাজির হওয়ার কথা ঘোষিত হয়েছে এই তালবিয়াতে।

হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাওহীদ অবলম্বনে নবীজি (সা.) তালবিয়া শুরু করলেন ও বললেন, আমি হাজির হে আল্লাহ! আমি হাজির! আমি হাজির, তোমার কোনো শরীক নেই। নিশ্চয় প্রশংসা ও নেয়ামত তোমার এবং রাজত্বও। তোমার কোনো শরীক নেই।"... তালবিয়ার এ সকল শব্দগুচ্ছের মাঝে এক আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার কথা বারবার উচ্চারিত হয়েছে এবং আল্লাহর একত্বের কথা বারবার আলোচিত হয়েছে। তালবিয়া যেন সকল প্রকার গাইরুল্লাহকে অস্বীকারের এক অমোঘ ঘোষণা। গাইরুল্লাহর মায়াজাল ছিন্ন করে মাওলার প্রেম-ভালোবাসায় আচ্ছন্ন হওয়ার এক আর্তনাদ, এক বিলাপ।

তাই হাজী বান্দার একান্ত কর্তব্য হচ্ছে, তালবিয়ার এ শব্দমালা উচ্চারণের সময় এর মর্ম অনুধাবন করা। অন্তরে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত-ভালোবাসা জাগিয়ে তোলা।

২. তাওয়াফের নামাযে ইখলাসের সূরা তেলাওয়াত :

সব ধরনের তাওয়াফের পর দুই রাক'আত নামায পড়া ওয়াজিব। রাসূল (সা.) এই দুই রাক'আতে সূরা ইখলাস ও কাফিরুন তেলাওয়াত করেছিলেন। যা ছিল তাওহীদের গুরুত্বের বহিঃপ্রকাশ। হযরত জাবের (রা.) বলেন, "নবীজি (সা.) এ দুই রাক'আতে তাওহীদের সূরা ও সূরা কাফিরুন তেলাওয়াত করলেন।"

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি (সা.) ইখলাসের দুই 'সূরা কাফিরুন ও কুল হুআল্লাহু আহাদ' তেলাওয়াত করেন।"...

৩. সাফা-মারওয়ার দু'আ :

সাফা-মারওয়ার সাঈকালীন যে দু'আ পড়ার বিধান রয়েছে সেখানেও গাইরুল্লাহকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং এক আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর নবীজি (সা.) সাফায় আরোহন করলেন। কা'বা দৃষ্টিগোচর হলে তিনি কেবলামুখী হয়ে আল্লাহর একত্বের কথা বললেন, তাঁর বড়ত্বের ঘোষণা দিলেন। তিনি এই দু'আ পড়লেন–

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدوهو على كل شئ قدير

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসাও তাঁর। তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। মারওয়াতে গিয়েও তিনি অনুরূপ করলেন।

কাজেই সাফা-মারওয়াতে গিয়ে হাজী বান্দার কর্তব্য হচ্ছে, নবীজি (সা.)-এর অনুসরণে এ দু'আ পড়া এবং এর অর্থ অনুধাবন করত আল্লাহর মহব্বত অন্তরে অঙ্কন করা। জল্পনা-কল্পনাতে সদাসর্বদা মাওলার ভালোবাসা লাভের প্রত্যাশা করা।

৪. আরাফার বিশেষ দু'আ :

আরাফার দু'আ ও যিকিরসমূহের মাঝে একই বিষয় স্থান করে নিয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর একত্ব ও লা শরীক হওয়া। নবীজি (সা.) ইরশাদ করেন, উত্তম দু'আ হলো আরাফার দিবসের দু'আ, আর আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের সর্বোত্তম দু'আটি ছিল–

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدوهو على كل شئ قدير

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসাও তাঁর। তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান।

৫. আরাফায় জোহর-আসর একত্রে আদায় :

যদিও হজের প্রতিটি হুকুম-আহকামের মাঝে এক আল্লাহর সাথে মহব্বতের সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন রয়েছে; কিন্তু আরাফার দিন মহব্বতের চরম পর্যায়ে গিয়ে মাওলার ভালোবাসা অন্তরে গেঁথে নেওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তাই আরাফাকে হজের মূল পর্ব বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

আরাফার ময়দানে আল্লাহ তা'আলার রহমত যেন মুষলধারায় নাযিল হতে থাকে। বাতাসের প্রতিটি ঝাপটা হৃদয়ে মাওলার মহব্বত জাগিয়ে তোলে। পুলকিত করে প্রতিটি হাজী বান্দার তপ্ত প্রাণ। সে এক অদ্ভুত অনুভূতি, যা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। আরাফার দিন শুধু আর শুধুই মাওলার সাথে বান্দার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার

দিন। হাদীস শরীফে এসেছে, "আরাফার দিবসে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং আরাফার ময়দানে সমবেত বান্দাদের নিয়ে ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করে বলেন, তোমরা দেখো আমার বান্দাদের অবস্থা। এলোমেলো চুল, ধূলিমলিন বদনে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে থেকে এসে পাগলপারা হয়ে আমার নামের তালবিয়াহ পাঠ করছে। তোমরা সাক্ষী থাকো আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। তখন ফেরেশতারা বলবে, হে আল্লাহ! অমুক অমুক বান্দা তো ব্যাভিচার ও নানা গুনাহে লিপ্ত থাকত। আল্লাহ পাক বলবেন, আমি তাদেরকেও ক্ষমা করে দিয়েছি। (মিশকাত-২২৯)

বান্দার সাথে মাওলার এই দয়ার মু'আমালা দেখে সেদিন মানুষের চির দুশমন ইবলিস শয়তানের কী অবস্থা হবে তার বিবরণও হাদীস শরীফে এসেছে। হযরত তালহা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, শয়তানকে আরাফার দিনের চেয়ে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অপদস্থ, হতাশ, নিরাশ ও ক্রোধান্বিত আর কোনো দিন দেখা যায়নি। আর তা একমাত্র রহমত অবতরণ ও বড় বড় গুনাহের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের ক্ষমার দৃশ্য অবলোকনের কারণে হবে। (মিশকাত-২২৯)

মোটকথা, আরাফার দিন মাওলা ও বান্দার মাঝে এত মহব্বতের সম্পর্ক স্থাপন হবে, যা শয়তানকে ঈর্ষান্বিত ও মর্মাহত করবে। তাই এ দিবসটি মাওলার কাছ থেকে সকল চাওয়া-পাওয়া আদায় করে নেওয়ার দিন। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, 'সর্বোত্তম দু'আ হচ্ছে আরাফার দু'আ।

মাওলার দরবারে আকুল প্রার্থনার এই মুহূর্তে যেন কোনো রূপ ব্যাঘাত না ঘটে তাই নামাযের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের সময়কেও পরিবর্তন করে আসরের নামাযকে জোহরের সাথে আদায়ের বিধান দেওয়া হয়েছে। সূর্য ঢলে যাওয়ার পর দুই নামায একসাথে আদায় করে বেলা ডোবার আগ পর্যন্ত যেন একাধারে অবিরাম বিরতিহীনভাবে কায়মনোবাক্যে বান্দা আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করতে পারে। অঝোরে অশ্রু ঝরিয়ে মাগফেরাতের সুধা পান করতে পারে। নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রার্থনা দু'আ, মুনাজাত আর যিকিরে মশগুল থেকে জীবনের তরে মাওলাকে আপন করে নিতে পারে। মনের গহিনে, হৃদয়ের মণিকোঠায় মাওলার প্রেম-ভালোবাসা আর মহব্বত পুরে নিতে পারে।

অথচ ওয়াক্ত মতো নামায আদায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, "নিশ্চয় নামায মুসলমানদের ওপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।" (নিসা-১০৩) তদুপরি আরাফার দিবসে আসর নামাযকে তার ওয়াক্তের পূর্বেই আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেন এই ব্যতিক্রম তা ভাবার বিষয়। আরাফার কী এমন গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত রয়েছে, যার জন্য নামাযের ওয়াক্তের মাঝে এই পরিবর্তন? আর তাও শুধু আরাফায় অবস্থানরত হাজীদের জন্য! আরাফায় সমবেত হাজীদের এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে আজ সেই মহান দিবস, যেদিন রাব্বুল আলামীন প্রথম আসমানে মাগফেরাতের পরওয়ানা নিয়ে আগমন করেন। জাবালে রহমতের পাদদেশে উপস্থিত বান্দাদের রহমতের চাদরে ঢেকে নেন। এই রহমতময় পরিবেশে দীর্ঘ মুনাজাত আর প্রার্থনার দ্বারা বান্দাও মাওলার মাঝে গভীর সম্পর্ক কায়েম হয়। আর এ সকল আয়োজনকে নির্বিঘ্ন করার জন্য পরিবর্তন করা হয়েছে আসরের ওয়াক্তের বিধানকে।

বস্তুত এ সকল বিষয়কে অনুভূতির পর্দায় হাজির করে আরাফার সময় কাটাতে পারলে হজের প্রকৃত স্বাদ অনুভবের আশা করা যায়। তাই হাজী বান্দার উচিত হলো, এই বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে একেবারে আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করে দু'আ-মুনাজাতে মশগুল থাকা গাইরুল্লাহর মহব্বত ধুয়ে-মুছে সাফ করে জীবনের তরে মাওলার সাথে মহব্বতের সম্পর্ক স্থাপন করা। (এই নগণ্যকেও দু'আয় শামিল করার অনুরোধ রইল।)

আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন :

আল্লাহ পাকের সাথে বন্ধুত্ব ও মহব্বতের দাবি হচ্ছে সর্বদা সকল কাজের মাঝে তাঁর পছন্দ-অপছন্দের প্রতি লক্ষ রাখা। সকল পদক্ষেপ তার ইচ্ছাধীন করে দেওয়া, তথা সদাসর্বদা তাকওয়া অবলম্বন করা। যে নিজের জীবনকে এভাবে পরিচালনা করতে পারবে, সেই আল্লাহর ওলী তথা মহব্বতের পাত্র হতে পারবে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, "মনে রেখো, যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোনো ভয়ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে। যারা ঈমান এনেছে এবং ভয় করতে রয়েছে।" (সূরা ইউনূছ-৬২-৬৩) অর্থাৎ আল্লাহর ওলী হলেন সে সমস্ত লোক, যাঁরা ঈমান এনেছেন এবং তাকওয়া-পরহেযগারী অবলম্বন করেছেন। তাঁদের জন্য দুনিয়া-আখেরাতে সুসংবাদ রয়েছে।

তাকওয়া অবলম্বনকে সহজতর করার জন্য আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে এর বিভিন্ন পন্থা ও লক্ষণ বাতলে দিয়েছেন। যার অন্যতম হচ্ছে হজের সময় আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্টভাবে

আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান-শ্রদ্ধা দেখানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এই সম্মান প্রদর্শনকে তাঁর নৈকট্য লাভ ও কল্যাণ অর্জনের মাধ্যম হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, 'এটা শ্রবণযোগ্য। কেউ আল্লাহর নামযুক্ত বস্তুসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে, তা তো তার হৃদয়ের তাকওয়ার কারণেই করবে।" (সূরা হজ-৩২)

অর্থাৎ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আন্তরিক খোদাভীতির লক্ষণ। যার অন্তরে খোদাভীতি থাকে সেই এগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পারে। অন্তরে খোদার ভয় ও মহব্বত থাকলে তার প্রতিক্রিয়া সব কাজকর্মে পরিলক্ষিত হয়। তাই হজ আদায়কালীন ও আল্লাহর মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ হয় শাআয়েরের প্রতি সম্মান দেখানোর মাধ্যমে।

হজের বিভিন্ন আহকামের মাঝে রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের চিত্র ফুটে ওঠে। নমুনাস্বরূপ কয়েকটি উল্লেখ করা হলো–

(ক) ইহরামের জন্য সাজগোজ করা :

হজের সূচনা হয় ইহরামের মাধ্যমে। এই ইহরামের জন্য নবীজি (সা.) নিজেকে প্রস্তুত করতে গিয়ে গোসল করেছেন, কেশ মোবারক তালবিদ করেছেন। অর্থাৎ এলোমেলো ভাব এড়াতে কোনো তরল পদার্থ মেখে কেশ স্থির করেছেন। উত্তম খোশবু মেখেছেন ইত্যাদি, যার দ্বারা ইহরামের প্রতি গুরুত্বারোপের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। হাদীস শরীফে এসেছে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) বলেন, তিনি দেখেছেন যে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইহরামের জন্য বস্ত্র ছেড়েছেন ও গোসল করেছেন। ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে চুল সুস্থিরকৃত (মুলাব্বাদ) অবস্থায় হজ শুরু করতে দেখেছি। এক বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি ইহরামের পরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গায়ে উত্তম খোশবু লাগাতাম।" (মেশকাত ২২৩)

(খ) কুরবানীর জন্তু সাথে আনা :

কুরবানীর জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) যুলহুলাইফা থেকে উট সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন, যা আল্লাহর নিদর্শনের মধ্যে গণ্য। পবিত্র কোরআনে এসেছে, উটগুলোকে আমি তোমাদের জন্য করেছি আল্লাহর নিদর্শন। (সূরা হজ-৩৬) ইবনে আব্বাস (রা.) এক বর্ণনায় বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যুলহুলাইফায় জোহরের নামায আদায় করলেন। তিনি উষ্ট্রী নিয়ে আসতে বললেন ও তাঁর কুজের ডান পার্শ্বে ক্ষত করে চিহ্নিত করলেন। রক্ত বেয়ে পড়ল অতঃপর তিনি দুটি জুতা দিয়ে মালা ঝোলালেন। (মুসলিম-১২৪৩) অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই মর্মে নিষেধাজ্ঞা যে, যে ব্যক্তি আরোহনের জন্তু পেল সে যেন কুরবানীর পশুতে আরোহন না করে- এতেও আল্লাহর নিদর্শনের প্রতি সম্মানের বিষয় ফুটে ওঠে। হযরত জাবের (রা.)-এর বর্ণনায় এসেছে, অপারগ অবস্থায় সৌজন্যের সাথে এতে আরোহন করো, যতক্ষণ না অন্য একটি বাহন পাও। (সহীহ মুসলিম-১৩২৪)

গ. উচ্চস্বরে বেশি বেশি তালবিয়া পাঠ :

ইহরামের পর থেকে ১০ যিলহজ জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহর (সা.) তালবিয়া পড়তে থাকা আল্লাহর নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানাদির প্রতি সম্মান প্রদর্শনেরই উদাহরণ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত তালবিয়া পড়তে থাকেন। ইবনে মাসউদ (রা.) এক বর্ণনায় বলেন, যিনি সত্যসহ মুহাম্মদকে পাঠিয়েছেন। তাঁর কসম, আমি মীনা থেকে আরাফায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে গিয়েছি, তিনি কখনো তালবিয়া পড়া থেকে বিরত হননি, জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত।...(সহীহ ইবনে খুযাইমাহ-২৮০৬) তাই হাজী বান্দার উচিত এই পুরো সময় বেশি বেশি তালবিয়া পড়া এবং কিছুটা আওয়াজ করে পড়া। কেননা তালবিয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বর উঁচু করতেন, যা সাহাবীগণ শুনতে পেতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, জিবরাঈল আমার কাছে এসেছেন, ঘোষিত আকারে তালবিয়া পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। (মুসনাদে আহমদ-২৯৫০) আবু সাঈদ (রা.) তাঁর বর্ণনায় বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে হজের তালবিয়া চিৎকার করে বলে বলে চলেছি। (সহীহ মুসলিম-১২৪৭)

(ঘ) মক্কা শরীফে প্রবেশের পূর্বে গোসল

মক্কায় প্রবেশের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা.) গোসল করেন সফরের অবসাদ ঝেড়ে ফেলার জন্য। আর মসজিদে হারামে প্রবেশের সাথে সাথে তিনি তাওয়াফ আরম্ভ করেন। এটাও হজের নির্ধারিত অনুষ্ঠানাদি ও নিদর্শনের সম্মান শ্রদ্ধার উদাহরণ। নাফে (রহ.) বর্ণন করেন, ইবনে ওমর (রা.) মক্কায় এলে 'যুতওয়া' নামক স্থানে রাত্রি যাপন করতেন। সেখানেই তিনি প্রভাত করতেন এবং গোসল সেরে নিতেন। অতঃপর তিনি দিনেরবেলায় মক্কায় প্রবেশ করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এরূপই করেছেন বলে তিনি উল্লেখ করতেন। (সহীহ মুসলিম-১২৫৯)

(ঙ) হাজরে আসওয়াদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন :

হাজরে আসওয়াদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যত্ন ও সম্মানবোধও আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান দেখানোর একটি অংশ। রাসূলুল্লাহ (সা.) হাজরে আসওয়াদকে আঁকড়ে ধরেছেন, চুমু খেয়েছেন এর ওপর সিজদা করেছেন এর পাশে কেঁদেছেন। তদ্রূপ হযরত ওমরও (রা.) হাজরে আসওয়াদকে চুমু খেয়েছেন, আঁকড়ে ধরেছেন ও বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে দেখেছি তোমাকে সম্মান দেখাতে। (সহীহ মুসলিম-১২৭১) ইবনে আব্বাস (রা.) এক বর্ণনায় বলেন, আমি ওমর ইবনুল খাত্তাবকে (রা.) দেখেছি হাজরে আসওয়াদের ওপর ঝুঁকে পড়তে এবং এই কথা বলতে, 'আমি নিশ্চয় জানি তুমি একটি পাথর, তোমাকে চুমু খেতে ও স্পর্শ করতে আমি আমার প্রিয় নবীকে না দেখলে তোমাকে চুমু খেতাম না, স্পর্শও করতাম না'। (মুসনাদে আহমদ-১৩১)

(চ) মাকামে ইবরাহীমে নামায :

এ পর্যায়ের আরেকটি উদাহরণ মাকামে ইবরাহীমের পেছনে নামায আদায়। হযরত যাবের (রা.) বলেন, অতঃপর তিনি মাকামে ইবরাহীমে গেলেন এবং পড়লেন–

واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى

অর্থাৎ তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থল রূপে গ্রহণ করো। (সূরা বাকারা-১২৫)

তিনি মাকামে ইবরাহীমকে তাঁর মাঝে ও কা'বা শরীফের মাঝে রেখে দাঁড়ালেন।

(ছ) সাফা-মারওয়ার সাঈ ও দু'আ :

নবীজি (সা.) সাফার নিকটবর্তী হয়ে তেলাওয়াত করলেন-

ان الصفا والمروة من شعائر الله

অর্থাৎ নিশ্চয় সাফা এবং মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের একটি। আমি শুরু করছি, যেটা দিয়ে শুরু করেছেন আল্লাহ। তিনি সাফা থেকে শুরু করলেন। সাফায় তিনি এতটুকু আরোহন করলেন যে কা'বা শরীফ দৃষ্টিগোচর হলো। তিনি কেবলামুখী হলেন, আল্লাহর একত্ববাদ ঘোষণা করলেন, তাকবীর পড়লেন এবং এই দু'আ পাঠ করলেন–

لا اله الا الله وحده لا شريك له---

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসাও তাঁর। তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূরণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন ও একাই তাঁর শত্রুদেরকে পরাজিত করেছেন। অতঃপর মারওয়াতেও তিনি অনুরূপ করলেন।

(জ) মাশআরুল হারামে দু'আ :

আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে তাজিম করা ও হজের পবিত্র অনুষ্ঠানাদির প্রতি যথাযথ সম্মান দেখানোর আরো একটি উদাহরণ মুযদালিফায় কুযাহ পাহাড়ের নিকট মাশআরুল হারামে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা। যেহেতু আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন–

ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم

অর্থাৎ তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই যে তোমরা তোমাদের প্রভুর করুণা তালাশ করবে। (সূরা বাকারা-১৯৮)

এ সময়ে তিনি আল্লাহর যিকিরে মত্ত থেকেছেন। আল্লাহর আশ্রয়ে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। তাঁর সামনে নিজেকে করেছেন অবনত।

হযরত জাবের (রা.) বলেন, তিনি আযান, ইকামতসহ ফজরের নামায পড়লেন, প্রভাতরশ্মি বের হয়ে এলে তিনি কাসওয়া নামক উটের পিঠে আরোহন করে মাশআরুল হারামে এলেন, কেবলামুখী হয়ে আল্লাহকে ডাকলেন, তাকবীর ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়লেন, একত্ববাদের ঘোষণা দিলেন। দিনের আলো ফুটে ওঠার আগ পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়েই রইলেন। অতঃপর সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রস্থান করলেন। (সহীহ মুসলিম-১২১৮)

(ঝ) তাওয়াফে যিয়ারত সুগন্ধি ব্যবহার

হজের অনুষ্ঠানাদির প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও গুরুত্বারোপের আরেকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে ১০ যিলহজ প্রাথমিক হালাল হওয়ার পর বাইতুল্লাহর যিয়ারতের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে সুগন্ধি মেখে দিয়েছি তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে। (ইবনে খুযাইমাহ-২৯৩৪)

মুশরিকদের বিপরীত আমল :

আল্লাহ পাকের কাছে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, ঘৃণ্য কাজ হচ্ছে শিরক, যা অমার্জনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য। পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে–

ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

তাই আল্লাহর প্রিয় ও খাঁটি বান্দা হতে হলে শিরকে ময়লা থেকে একেবারে পরিষ্কার হতে হবে। কোরআনে কারীমে বলা হয়েছে–

الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم

এতে বোঝা গেল যে ইসলাম ও শিরক বিপরীতমুখী দুটি বিষয়, যা কোনো দিন একত্রিত হতে পারে না। এ দুয়ের একটির উপস্থিতির অর্থ অন্যটির বিদায়। ঠিক রাত-দিনের বৈপরীত্বের মতোই।

হজ পালনকালে নবীজি (সা.) ইচ্ছাকৃতভাবে মুশরিকদের উল্টো কাজ করতে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। নিজে কোনো সময় এই বিরোধিতা প্রদর্শনে অপরাগ হলে সাহাবাদেরকে নির্দেশ দিতেন মুশরিকদের বিপরীত কাজ করতে। বিষয়টির প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘোষণা দেন যে,

هدينا مخالف لهديهم

"আমাদের আদর্শ তাদের আদর্শ থেকে ভিন্ন।" আরাফার খুতবায় তিনি মুশরিকদের কার্যকলাপকে চিরতরে স্থগিত ঘোষণা করেছেন। তন্মধ্যে জাহেলিয়াতের সকল রক্তপণ ও সুদ উল্লেখযোগ্য।

হজের যে সকল অনুষ্ঠানে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইচ্ছাকৃতভাবে মুশরিকদের বিপরীত কাজ করেছেন তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো–

(ক) তালবিয়া :

মুশরিকরা তাদের তালবিয়ার মাঝে শিরক মিশ্রিত করত এবং বলত–

لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه ومامللك

"তোমার কোনো শরীক নেই তবে একজন অংশীদার বাদে, যার তুমি মালিক এবং তার যা কিছু রয়েছে তারও এর বিপরীত রাসূলুল্লাহ (সা.) তালবিয়াকে শিরকমুক্ত করলেন এবং একত্ববাদের ঘোষণা দিয়ে ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করলেন এবং পড়লেন–

ان الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك

"নিশ্চয় সকল প্রশংসা এবং নিয়ামতরাজি তোমার, রাজত্ব তোমার। তোমার কোনো শরীক নেই।"

(খ) আরাফায় অবস্থান :

জাহেলিয়াতের যুগে মক্কার কুরাইশগণ হজের সময় আরাফার ময়দানে গমন করত না। শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে তারা ভাবত যে হারাম শরীফের সীমানা ছেড়ে বাইরে গেলে আমাদের মান ক্ষুণ্ন হবে। তাই অন্য সবাই আরাফায় গিয়ে অবস্থান করলেও কুরাইশগণ মুযদালিফা থেকেই ফিরে আসত। এই প্রথার বিরোধিতা করে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে কুরাইশ হওয়া সত্ত্বেও ৯ যিলহজ আরাফায় অবস্থান করলেন এবং সকল সাহাবায়ে কেরামও সেখানে অবস্থান করলেন।

(গ) আরাফা ও মুযদালিফা থেকে প্রস্থান

আরাফা ও মুযদালিফা থেকে প্রস্থানের ক্ষেত্রে মুশরিকদের প্রথা ছিল তারা ইসলামপূর্ব যুগে আরাফা থেকে সূর্যাস্তের আগে এবং মুযদালিফা থেকে সূর্যোদয়ের পর প্রস্থান করত। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিপরীত সূর্যাস্তের পর আরাফা থেকে প্রস্থান ও সূর্যোদয়ের পূর্বে মুযদালিফা থেকে প্রস্থানের বিধান জারি করেন।

হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আরাফায় আমাদেরকে উদ্দেশ করে বক্তৃতা করলেন, তিনি আল্লাহর প্রসংশা ও গুণকীর্তন করলেন এবং বললেন, মুশরিক ও পৌত্তলিকরা এখান থেকে প্রস্থান করত সূর্যাস্তের সময়, যখন সূর্য পাহাড়ের মাথায় পুরুষের পাগড়ির মতোই অবস্থান করত। আমাদের আদর্শ ওদের থেকে ভিন্ন। (বাইহাকী ৫/১২৫)

আমর ইবনে মাইমুন বলেন, ওমর ইবনুল খাত্তাবের সাথে হজ করেছি। আমরা যখন মুযদালিফা থেকে প্রস্থান করতে চাইলাম তিনি বললেন, মুশরিকরা বলত ছাবির পর্বতের ওপর সূর্য উদিত হউক, যাতে দ্রুত গমন করতে পারি। আর তারা সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রস্থান করত না। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের উল্টো করেছেন এবং সূর্যোদয়ের পূর্বেই প্রস্থান করেছেন। (বুখারী ১৬৮৪)

(ঘ) হজের সাথে উমরা আদায় :

মুশরিকরা মনে করত হজের মাসসমূহে উমরা করা জঘন্যতম অপরাধ। তারা যিলহজ ও মুহাররম অতিক্রম হওয়ার পূর্বে উমরা হারাম মনে করত। তাদের সাথে আদর্শিক ভিন্নতা সৃষ্টির লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.) হজের মাসে উমরা বা হজ্জে তামাত্তুকে বৈধ ঘোষণা করেন। বিদায় হজে সাহাবাদের মধ্যে যারা কুরবানীর পশু সঙ্গে নিয়ে আসেনি তাদেরকে তামাত্তু করতে নির্দেশ দেন। যাতে তাদের হজ মুশরিকদের বিপরীত হয়। তদ্রূপ হজের পর হযরত আয়েশা (রা.) কে উমরা করানো মুশরিকদের উল্টো প্রথার প্রচলন করার জন্যই হয়েছিল। ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর কসম মুশরিকদের প্রথা বাতিল করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) আয়েশা (রা.) কে যিলহজ মাসে উমরা করিয়েছেন। (আবু দাউদ-১৯৮৭)

(ঙ) সাফা-মারওয়ায় সাঈর প্রচলন :

জাহেলী যুগে মুশরিকরা সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করত না। কেননা তারা মূর্তির উদ্দেশ্যে হজ পালন করত এবং মনে করত যে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করা বৈধ নয়। তাদের এ প্রথার বিপরীত করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈর বিধান চালু করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) আনসারদেরকে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করার নির্দেশ দিয়ে বললেন। সাঈ করো, কেননা আল্লাহ তোমাদের ওপর সাঈ লিখে দিয়েছেন। (ইবনু খুযাইমাহ-২৭৬৪)

এ সকল আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে হজের মাঝে উম্মতকে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে তারা যেন কাফের-মুশরিকদের পথ-মত ও রীতিনীতির ওপর না চলে এবং একমাত্র তাওহীদের শিক্ষার ওপর অটল অবিচল থাকে। আর তাওহীদ পূর্ণ হয় মূলত আল্লাহর মহব্বত ও নিসবতে ইহসান অর্জনের মাধ্যমে। রাসূল (সা.)-এর এই আদর্শকে বক্ষে ধারণ করে যে ব্যক্তি হজের এ সকল আচার-অনুষ্ঠানগুলো পালন করবে এবং আজীবন এই আদর্শমতে চলবে সত্যি সে বড় ভাগ্যবান। কেননা যে কোনো জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করল, সে তাদেরই দলভুক্ত হলো। আর যে কোনো জাতিকে ভালোবাসল তার হাশর তাদের সাথেই হবে।

মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার-১৫

মুফতী ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী

এক মিলিয়ন হাদীস এক ডিস্কে পাওয়া যায়

ডা. জাকির নায়েক মাযহাব না মানার পক্ষে যে সমস্ত যুক্তি দেখিয়েছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি যুক্তি হলো, বর্তমান সময় বিজ্ঞান ও টেকনোলজির যুগ। যেকোনো তথ্য খুব সহজে সংগ্রহ করা সম্ভব। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

'বর্তমান যুগ হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। ইমামদের সময় একটি হাদীস সংগ্রহ করার জন্য শত শত, হাজার হাজার কিলোমিটার সফর করতে হতো। কেননা তখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ততটা উন্নত ছিল না। বর্তমান যুগ হলো, ই-মেইলের যুগ, ফ্যাক্সের যুগ। সেকেন্ডের মধ্যে এখান থেকে আমেরিকায় যেকোনো তথ্য পাঠানো সম্ভব।'

ডা. জাকির নায়েক পরবর্তীতে বলেছেন,

Today if you want to have all the Sahih Hadith, you can have on a disk, the complete bukhary we can have on a disk, Bukhary,Muslim, in IRF on million Hadith on one disk. Classified, Sahih, Zaif, Mauzu.

'বর্তমান সময়ে তুমি যদি সমস্ত সহীহ হাদীস সংগ্রহ করতে চাও, তবে তা একটি ডিস্কে পাওয়া সম্ভব। সম্পূর্ণ বুখারী এক ডিস্কে পাওয়া যায়। একইভাবে, বুখারী, মুসলিম। আইআরএফে একটি ডিস্কে এক মিলিয়ন হাদীস রয়েছে। যেগুলোর শ্রেণী বিভাগ করা রয়েছে–সহীহ, যয়ীফ, মওযু। সুতরাং ইমামদের যুগের তুলনায় বর্তমান সময়ে হাদীস সংগ্রহ করা খুবই সহজ।' (ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ, http://qaazi.wordpress.com/2008/07/28/various-public-lectures-by-dr-zakir-naik/)

ডা. জাকির নায়েকের এ বক্তব্যটি যুক্তিসঙ্গত যে, বর্তমান সময়ে বিভিন্ন হাদীস সম্পর্কে খুব সহজে অবগত হওয়া সম্ভব। কিন্তু পৃথিবীর কোনো বিষয়ের জ্ঞানের জন্য কি ওই বিষয়ের সব পুস্তক তার নিকট থাকাটাই যথেষ্ঠ? ডা. জাকির নায়েক নিজে একজন ডাক্তার, তিনি কি কখনও এ বিষয়কে যথেষ্ঠ মনে করবেন যে, এক লোক বাজার থেকে কয়েক শ' বিখ্যাত মেডিক্যালের বই কিনে পড়লে সে ডাক্তার হয়ে যাবে? অন্যকে প্রেসক্রিপশন দিতে পারবে? আর এ ধরনের ডাক্তারের মাধ্যমে রোগীর রোগ নিরাময় হবে, নাকি মৃত্যুর কারণ হবে?

পৃথিবীর কোনো বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জনের জন্য যদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দু-একটি বই পড়া যথেষ্ঠ না হয়, তবে ধর্মীয় বিষয়ের জ্ঞানের জন্য শুধু হাদীসের কিতাবকেই যথেষ্ঠ মনে করা হয় কেন?

এক মিলিয়ন কেন, কারও নিকট যদি দশ মিলিয়ন হাদীসও থাকে, তবুও কি তার জন্য কিতাব পাঠ করে হাদীসের ওপর আমল করা সম্ভব?

এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেছেন,

لو فرض إنحصار حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم فيها اى فى الدواوين :فليس كل ما فى الكتاب يعلمه العالم، ولا يكاد يحصل ذلك لأحد ، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة و هو لا يحيط بما فيها، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم با لسنة بكثير ... فكانت دواوينهم صدورهم التى تحوى أضعاف ما فى الدواوين ، و هذا أمر لا يشك فيه من علم القضية

যদি ধরে নেওয়া হয় যে, রাসূল (সা.)-এর সমস্ত হাদীসের কিতাবসমূহে সংকলন করা হয়েছে এবং রাসূল (সা.)-এর হাদীস এর মাঝেই সীমাবদ্ধ, তবে কোনো আলেম হাদীসের কিতাবের সকল বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করবে, এটি সম্ভব নয়। আর কারও পক্ষে এটি ঘটেও না। বরং কারও নিকট সংকলিত অনেক হাদীসের কিতাব থাকতে পারে, কিন্তু সে এ সমস্ত কিতাবের সকল বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে সমর্থ হয় না। প্রকৃতপক্ষে এ সমস্ত কিতাব সংকলনের পূর্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। তাঁদের কিতাব ছিল, তাঁদের অন্তর, যাতে সংরক্ষিত ছিল, এ সমস্ত সংকলিত কিতাব থেকে কয়েক গুণ বেশি হাদীস। আর এ বিষয়ে জ্ঞান রাখে, এমন কেউই বিষয়টির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে না।'

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর বক্তব্য থেকে এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ থাকে না যে, হাদীসের বিষয়ে কিতাবসমূহ সংকলিত হওয়ার পূর্বে একেক মুহাদ্দিস ও ফকীহ সংকলিত হাদীসের কিতাবসমূহের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি হাদীস জানতেন।

যেমন–

১. আল্লামা ইবনুস সালাহ থেকে বর্ণিত,

وقال ابن الصلاح رحمه الله " : -وقد قال البخارى :أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتى ألف حديث غير صحيح ،

'ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, আমি এক লক্ষ সহীহ হাদীস জানি এবং সহীহ নয়,

এমন দুই লক্ষ হাদীস জানি।
[মুকাদ্দামাতু ইবনিস সালাহ, পৃষ্ঠা-১০]
২. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) সাড়ে সাত লক্ষ হাদীসের হাফেয ছিলেন।
৩. ইমাম মুসলিম (রহ.) তিন লক্ষ হাদীস থেকে মুসলিম শরীফ লিপিবদ্ধ করেছেন।
৪. ইমাম আবু দাউদ (রহ.) পাঁচ লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে আবু দাউদ শরীফ রচনা করেছেন।
৫. ইমাম আবু যুরআ' (রহ.) সাত লক্ষ হাদীসের হাফেয ছিলেন।
ইসলামের ইতিহাসে অসংখ্য হাফেযে হাদীসের জন্ম হয়েছে। আমরা জানি হাফেযে হাদীস বলা হয়, সেই মুহাদ্দিসকে, যিনি ন্যূনতম এক লক্ষ হাদীস সনদ ও মতনসহ হিফয করেছেন এবং সেটি আয়ত্তে রেখেছেন।
'তাযকিরাতুল হুফফায' নামক কিতাবে হাফেযে হাদীসদের জীবনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ সমস্ত মুহাদ্দিস লক্ষ লক্ষ হাদীস মুখস্থ করা সত্ত্বেও স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার দাবি করেননি, কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, বর্তমান সময়ে যারা বিশুদ্ধভাবে একটি হাদীস পাঠ করার যোগ্যতা রাখে না, তারাও মুজতাহিদ ইমাম হওয়ার দাবি করে ফাতওয়া প্রদান করে থাকে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাজত করুন!
এ প্রসঙ্গে খতীবে বাগদাদী (রহ.) 'আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ' নামক কিতাবে লেখেছেন,

قيل لبعض الحكماء :إن فلانا جمع كتبا كثيرة !فقال :هل فهمه على قدر كتبه؟ قيل :لا، قال فما صنع شيئا، ما تصنع البهيمة بالعلم .

কোনো এক বিজ্ঞজনকে বলা হলো, অমুক ব্যক্তি অনেক কিতাব সংগ্রহ করেছে। তিনি তাঁকে বললেন, তার বুঝ কি তার সংগৃহীত কিতাবের সমান? ওই লোক উত্তর দিলেন, না। তখন তিনি বললেন, প্রকৃতপক্ষে সে কিছুই করেনি। চতুষ্পদ জন্তু ইলম দিয়ে কী করবে!
অর্থাৎ বুঝ অর্জন না করে কিতাব সংগ্রহ করা; আর একটি জন্তুর নিকট অনেক কিতাব থাকা সমান।
সুতরাং কিতাব সংগ্রহের নাম ইলম নয়। কারও নিকট অধিক হাদীস থাকার কারণে সে যদি বড় আলেম হয়ে যেত, তবে যার নিকট এক ডিস্কের মধ্যে সমস্ত হাদীসের কিতাব রয়েছে, সেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আলেম হয়ে যেত। চল্লিশ টাকার একটা ডিস্ক সংগ্রহ করা, আর ইলমের পিছে চল্লিশ বছর সাধনা করা এক জিনিস নয়। সুতরাং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির দোহাই দিয়ে এ কথা বলা যথেষ্ঠ নয় যে আমার নিকট এক মিলিয়ন হাদীসের একটি ডিস্ক আছে, সুতরাং কাউকে অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা নেই। বিষয়টি যদি এমনই হতো, তবে পৃথিবীর যে কেউ ডিস্ক সংগ্রহ করবে, সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ আলেম হয়ে যাবে।
খতীবে বাগদাদী (রহ.) ইয়াহইয়া ইবনে মুইন (রহ.)-এর উক্তি বর্ণনা করেছেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো,
কেউ যদি এক লক্ষ হাদীস মুখস্থ করে, তবে কি সে ফাতওয়া দিতে পারবে? তিনি উত্তর দিলেন, না। পুনরায় প্রশ্ন করা হলো, দুই লক্ষ হাদীস মুখস্থ করলে কি ফাতওয়া দিতে পারবে? তিনি বললেন, না। পুনরায় প্রশ্ন করা হলো, যদি তিন লক্ষ হাদীস মুখস্থ করে? তিনি উত্তর দিলেন, না। চার লক্ষ তিনি বললেন, না'। যদি পাঁচ লক্ষ হাদীস মুখস্থ করে? তিনি উত্তর দিলেন, আশা করা যায়।
খতীবে বাগদাদী (রহ.) এ উক্তি বর্ণনা করে বলেছেন, পাঁচ লক্ষ হাদীস শুধু মুখস্থ করাটাই উদ্দেশ্য নয়। বরং প্রতিটি হাদীসের মর্ম উপলব্ধি করা এবং সে সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জন করা আবশ্যক। তিনি লিখেছেন,

وليس يكفيه إذا نصب نفسه للفتيا أن يجمع فى الكتب ما ذكره-يحى بن معين-دون معرفته به و نظره فيه، و إتقانه له، فإن العلم هو الفهم و الدراية و ليس با لإكثار و التوسع فى الرواية

'কারও পক্ষে নিজেকে ফাতওয়ার আসনে সমাসীন করার জন্য ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন (রহ.) যে পরিমাণ হাদীসের কথা বলেছেন, সেগুলো সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জন এবং তীক্ষ্ণ জ্ঞান অর্জন ব্যতীত তা সংগ্রহ করাটাই যথেষ্ঠ নয়। কেননা ইলম হলো, প্রকৃত বুঝ ও ব্যুৎপত্তি অর্জনের নাম। অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করার নাম ইলম নয়।'
(আল-জামে, ২/১৭৪)

সুতরাং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির দোহাই দিয়ে শুধু হাদীস সংগ্রহ করাটা ইসলামের উদ্দেশ্য নয়। আর কেউ যদি অনেক হাদীস সংগ্রহ করেও, তবুও কি সে সরাসরি কোরআন ও হাদীসের ওপর আমল করতে সক্ষম হবে? ইজতেহাদের অন্য যে সমস্ত শর্ত রয়েছে সেগুলো অর্জন করা আবশ্যক নয় কি?
বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা.) বলেছেন,

إنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتَّى إذا لم يُبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهَّالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلُّوا وأضلُّوا

'আল্লাহ্ তা'আলা ইলমকে তার বান্দাদের থেকে উঠিয়ে নেবেন না। বরং তিনি আলেমদেরকে উঠানোর মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেবেন। এমনকি একসময়

কোনো আলেমই অবশিষ্ট থাকবে না। মানুষ তখন অন্ধ-মূর্খ লোকদের নিকট প্রশ্ন করবে, তারা ইলম ব্যতীত ফাতওয়া দেবে। ফলে তারাও পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।

[বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৬৮৭৭, ১০০ মুসলিম হাদীস নং ২৬৭৩]

এ হাদীসে রাসূল (সা.) সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে, ইলমের অস্তিত্ব? নির্ভর করে উলামাদের অস্তিত্বের ওপর। আলেম এবং ইলম পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং ইলমকে টেকনোলজির অনুগামী মনে করা কতটা যুক্তিসঙ্গত?

'ইমাম আবু হাইয়্যান উন্দুলুসী (রহ.) বলেছেন,

يظن الغمر ان الكتب تهدى ... اخا
جهل لادراك العلوم لا يدرى الجهول
بان فيها ...غوامض حيرت عقل الفهيم
اذا رمت العلوم بغير شيخ ...ضللت
عن الصراط المستقيم

'মূর্খ, অনভিজ্ঞ লোক মনে করে থাকে যে, কিতাব তাকে ইলম অর্জনে পথ প্রদর্শন করবে। কিন্তু মূর্খ লোকেরা জানে না যে, তাতে এমন দুর্বোধ্য বিষয় থাকে যে, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

যদি তুমি উস্তাদ ব্যতীত ইলম অর্জন করো, তুমি সরল-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে?

হাফেযে হাদীস আবু বকর খতীবে বাগদাদী (রহ.) বলেন,

لا يؤخذ العلم الا من افواه العلماء ..فلابد من تعلم امور الدين من عارف ثقة اخذ عن ثقة وهكذا الى الصحابه فالذى ياخذ الحديث من الكتب يسمى صحافيا .والذى ياخذ القرأن من المصحف يسمى مصحفيا ولا يسمى قارئا.

'আলেমদের থেকে শ্রবণ ব্যতীত ইলম শিক্ষা করা যায় না। সুতরাং ইলম অর্জনের পথে এমন একজন বিশ্বস্ত আলেম থেকে ইলম অর্জন করতে হবে, যিনি আরেকজন সিকা (বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য) আলেম থেকে ইলম অর্জন করেছেন, এভাবে সাহাবীদের পর্যন্ত ইলমের ধারা পৌঁছে যাবে। যে ব্যক্তি কিতাব পড়ে, হাদীস গ্রহণ করে তাকে 'সাহাফী' বলা হয়। (তাকে মুহাদ্দিস বলা হয় না)। আর যে ব্যক্তি মাসহাফ থেকে কোরআন গ্রহণ করে তাকে 'মাসহাফী' বলা হয়, তাকে কারী বলা হয় না।'

কামালুদ্দিন শামানীর বিখ্যাত কবিতা–

من يأخذ العلم عن شيخ مشافهةً
يكن من الزيف والتصحيف فى حرمِ
ومن يكن آخذاً للعلم من صحف
فعلمه عند أهل العلم كالعدم

'যে ব্যক্তি তাঁর শায়েখের নিকট থেকে সরাসরি ইলম শিক্ষা করে, সে বিকৃতি ও জালিয়াতি থেকে পবিত্র থাকে।

আর যে ব্যক্তি কিতাব পড়ে ইলম অর্জন করে, আলেমদের নিকট তার ইলম কোনো ইলমই নয়।'

আল্লামা শাওকানী (রহ.) লিখেছেন,

إنَّ إنصاف الرجل لا يتمُّ حتَّى يأخذ كلَّ فنٍّ عن أهله كائناً ما كان

'কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠার ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে জ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় অভিজ্ঞ লোকদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করবে।'

আল্লামা শাওকানী (রহ.) আরও বলেছেন,

وأمَّا إذا أخذ العلم عن غير أهله، ورجَّح ما يجده من الكلام لأهل العلم فى فنون ليسوا من أهلها ، فإنَّه يخبط ويخلط

'আলেম যদি অযোগ্য লোকের কাছ থেকে ইলম শিক্ষা করে এবং জ্ঞানের সংশ্লিষ্ট শাখায় পারদর্শী নয়, এমন লোকের বক্তব্যকে সে প্রাধান্য দেয়, তবে সে অনুমাননির্ভর এবং অবিমৃশ্যকারী।' [আদাবুত তলাব ও মুনতাহাল আরাব, পৃষ্ঠা-৭৬]

আল্লামা সাখাবী (রহ.) লিখিত 'আল-জাওয়াহির ওয়াদ দুরার' নামক কিতাবে রয়েছে,

"من دخل فى العلم وحده؛ خرج وحدَه "

'যে ব্যক্তি একাকী ইলমের পথে প্রবেশ করল, সে একাকী সেখান থেকে বের হয়ে গেল।'

[আল জাওয়াহির ওয়াদ দুরার, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৮]

সালফে সালেহীনের বিখ্যাত উক্তি হলো–

من أعظم البلية تشيخ الصحيفة

'কিতাবকে নিজের উস্তাদ বানানো বড় বড় মুসীবতের অন্যতম।'

[আল্লামা ইবনে জামাআ (রহ.) তাযকিরাতুস সামে, পৃষ্ঠা-৮৭]

আবু যুরআ (রহ.) বলেন,

لا يفتى الناس صحفى ,ولا يقرئهم مصحفى

'বই পড়ে কেউ ফাতওয়া দেবে না এবং কোরআন পড়ে কেউ কারী হবে না।'

[আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, পৃষ্ঠা-১৯৪]

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন,

من تفقه من بطون الكتب ضيَّع الأحكام

'যে ব্যক্তি কিতাব পড়ে ফকীহ হলো, সে শরীয়তের হুকুমকে জলাঞ্জলি দিল।'

[তাযকিরাতুস সামে, ওয়াল মুতাকাল্লিম, পৃষ্ঠা-৮৩]

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গঃ রোযার কাফফারা

মুহা: আলী আহমদ
বাড্ডা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

একজন রোযা থাকা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করেছেন। এভাবে দুটি রোযা এক বছর। আরো দুটি রোযা অপর বছর। এখন ষাটটি করে রোযা রাখার যে ফায়সালা তাও কঠিন এবং অতিব মুজাহাদার। আবার এখানে ষাটটির মধ্যে একটি ভেঙে ফেললে আবার রাখতে হয়। আবার তার আর্থিক অবস্থাও তত ভালো নেই। মধ্যবিত্ত আয়ের মানুষ। কিন্তু ভুলবশত হয়ে গেছে। এখন তার নিজের ভাইও দরিদ্র তাই যদি সে তার আপন ভাইকে দুই মাস দুই বেলা করে খাওয়ায় অথবা প্রত্যেক দিনের টাকা যদি প্রত্যেক দিন দিয়ে দেয় তবে সহীহ হবে কি না?

সমাধান :

প্রশ্নে উল্লিখিত অবস্থায় নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী সতর্কতামূলক চারটি রোযার কাজা ও কাফফারা আদায় করা আবশ্যক। তবে রোযার মাধ্যমে কাফফারা আদায়ে একান্ত অপারগ হলে খাবার বা তার মূল্য আদায়ের মাধ্যমে দায়মুক্ত হওয়া যাবে। এ ক্ষেত্রে আপনার দরিদ্র ভাইকে প্রতিটি রোজার কাফফারাস্বরূপ ষাট দিনব্যাপী দুবেলা খাবার বা প্রতিদিন সর্বনিম্ন পৌনে দুই সের গমের মূল্য দিয়ে দিতে পারেন। তবে ষাট দিনের খাবার বা টাকা একসাথে দেওয়া যাবে না। এভাবে চারটি রোজার কাফফারা ২৪০ দিন আদায় করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা জরুরি নয়। (আদ্দুররুল মুখতার ১/১৫১, আহসানুল ফাতওয়া ৪/৪৩৯)

প্রসঙ্গ : ফারায়েয

মুহা: রাশেদ মৃধা
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

খোলা তালাকের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ করে স্বামী তার সমস্ত পাওনা বুঝিয়ে দিয়ে দেন। তার এক মাস পরে স্বামী মৃত্যুবরণ করেন। এখন স্ত্রী ওই স্বামীর কোনো সম্পত্তি দাবি করতে পারবে কি না?

সমাধান :

খোলা তালাকের দরুন তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় ইদ্দতের মাঝে স্বামী ইন্তেকালের ফলে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার সম্পদে কোনো অংশ পাবে না। (আদ্দুররুল মুখতার ১/২৩৬, বাদায়িউস সানায়ে ৪/৪০৩)

প্রসঙ্গ : যিকির

মুহা: হাবিবুর রহমান
সিংগাইর, মানিকগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা-১

উচ্চস্বরে যিকির করা শরীয়তসম্মত কি না? এবং উচ্চ স্বরের পরিমাণ কী?

সমাধান-১

উচ্চস্বরে যিকির করা শরীয়তসম্মত। তবে এর জন্য শর্ত হলো এর দ্বারা যেন অন্য কারো নামাজে, তেলাওয়াতে বা ঘুমে ব্যাঘাত না হয়। আর উচ্চস্বরের কোনো পরিমাণ নির্ধারিত নেই, তবে তা এত বিকট শব্দে যেন না হয় যদ্দরুন স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়, সেদিক লক্ষ রাখা জরুরি। (রদ্দুল মুহতার ৬/৩৯৮, খাইরুল ফাতওয়া ১/৩৪৯)

জিজ্ঞাসা-২

মসজিদে একত্রিত হয়ে উচ্চ আওয়াজে একতালে সমস্বরে যিকির শরীয়ত সমর্থন করে কি না এবং এ ক্ষেত্রে লাগাতার করা বা দিন-তারিখ নির্দিষ্ট করে করার বিধান কী?

সমাধান-২

হকপন্থী শায়খে তরীকতের পরামর্শে আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে মসজিদে একত্রিত হয়ে উচ্চ আওয়াজে যিকির করা জায়েয। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে তালে তাল মেলানো নিষেধ। এ ক্ষেত্রে লাগাতার করা বা দিন-তারিখ নির্দিষ্ট করে করতে কোনো সমস্যা নেই। তবে এই পদ্ধতিকে আত্মশুদ্ধির একমাত্র পদ্ধতি বা বাধ্যতামূলক মনে করার অবকাশ নেই। (রদ্দুল মুহতার ১/৬৩)

প্রসঙ্গ : বেতন

আব্দুল্লাহ
মিরপুর, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

মাদরাসার কোনো শিক্ষক যদি দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থ হয়ে যায়। তাহলে সে অসুস্থতাকালীন অনুপস্থিতির বেতন পাবে কি না? যদি পায় তাহলে কত দিনের বেতন পাবে। আর না পেলে কেন পাবে না?

সমাধান :
শিক্ষকের অসুস্থতাকালীন বেতনসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী ফয়সালা করা হবে, যদি পূর্ব থেকে এ বিষয়ে কোনো নীতিমালা না থাকে তবে উপস্থিত যেকোনো সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করতে পারবে। তবে সকল শিক্ষকের জন্য এক নিয়ম অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। (এমদাদুল ফাতাওয়া ৩০/৩৪৭)

প্রসঙ্গ : তারাবী, মসজিদ
মুহা: আশরাফ আলী
উত্তরা, ঢাকা।
জিজ্ঞাসা-১
তারাবীর নামায কত রাক'আত? আট রাক'আত, নাকি বিশ রাক'আত দলিলসহ উল্লেখ করুন।
সমাধান-১
তারাবীর নামায বিশ রাক'আত। (মুসান্নাফে আবী শাইবাহ ৫/২২৫)
জিজ্ঞাসা-২
মহিলারা যদি মসজিদে গিয়ে তারাবীর নামায আদায় করে পুরুষদের সাথে পার্টিশন বা পর্দার মাধ্যমে তাহলে তাদের এভাবে নামায পড়া জায়েয হবে কি না? যদি জায়েয হয়ে থাকে তাহলে কিভাবে পড়বে আর যদি জায়েয না হয়ে থাকে তাহলে কিভাবে পড়বে?
সমাধান-২
তারাবীসহ যেকোনো নামাযের জামা'আতে শরীক হওয়ার জন্য মহিলাদের মসজিদে যাওয়া মাকরূহে তাহরীমী তথা নাজায়েয। তাই তারা মসজিদে না গিয়ে ঘরের আন্দরমহলে একাকী নামায আদায় করবে। (সহীহুল বুখারী ১/১২০)
জিজ্ঞাসা-৩
সরকারি জমিতে পাঁচ ওয়াক্তের নামায কাগজে-কলমে ওয়াক্ফ ব্যতীত জায়েয আছে কি না? এবং ওয়াক্ফ ছাড়া জুমু'আর নামায আদায় করাও জায়েয হবে কি না?
সমাধান-৩
সরকার কাগজে-কলমে ওয়াক্ফ না করে মৌখিকভাবে ওয়াক্ফ বা মসজিদের জন্য অনুমতি দিলে তা মসজিদ হয়ে যাবে এবং নামায সহীহ হবে আর যদি অনুমতি না দেয় তাহলে নামায হয়ে যাবে। কিন্তু তা শরয়ী মসজিদ বলে গণ্য হবে না। আর ওয়াক্ফকৃত মসজিদ ছাড়া জুমু'আর নামায আদায় করা সহীহ হবে, তবে শরয়ী মসজিদের ফজীলত থেকে বঞ্চিত হবে। (সহীহ বুখারী ১/৪৮)
জিজ্ঞাসা-৪
মসজিদের মেহরাব মসজিদের অংশ কি না? যদি ইমাম সাহেব মেহরাবের ভেতরে দাঁড়ান তাহলে নামাযের কোনো সমস্যা হবে কি না?
সমাধান-৪
মসজিদের মেহরাব মসজিদেরই অংশ, তবে যদি ইমাম সাহেব বিনা প্রয়োজনে পরিপূর্ণ মেহরাবের ভেতরে দাঁড়ান তাহলে নামায মাকরূহ হবে। (আদ্দুররুল মুখতার ১/৯২)

প্রসঙ্গ : রুসুম-রেওয়াজ
মাও. দিলাওয়ার হোসেন
ফুলগাজী, ফেনী।
জিজ্ঞাসা :
আমরা বিভিন্ন সময় কোনো কাজ করতে ইচ্ছা করলে উলামায়ে কেরাম তা রুসুম ও প্রথা বলে অবিহিত করে তা করতে নিষেধ করেন। এখন আমার প্রশ্ন হলো, শরীয়তের আলোকে রুসুম ও প্রথা কাকে বলে? এবং কোনো কাজ রুসুম হওয়ার জন্য শরীয়তের নির্ধারিত কোনো নিয়ম আছে কি না? রুসুমের হুকুম কী?
সমাধান :
রুসুম : ওই সমস্ত প্রচলন বা নিয়মনীতিকে বলে, যার ভিত্তি কোরআন, হাদীস বা সাহাবায়ে কেরামের আমল থেকে পাওয়া যায় না, বরং সেগুলো কেবলমাত্র সামাজিক প্রচলন, যার পরিপালন মানুষ আবশ্যক মনে করে এবং না করাকে খারাপ মনে করে, আর শরীয়তবিরোধী সমস্ত প্রথা ও বিধর্মী তথা কাফের-মুশরিকদের সকল প্রকার প্রথা পালন করা মুসলমানদের জন্য হারাম হওয়ায় তা থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য। তবে যে সমস্ত প্রথা শরীয়ত পরিপন্থী নয়, সেগুলোকে আবশ্যক মনে না করলে, তা পালন করার অবকাশ রয়েছে, আর আবশ্যক মনে করলে এবং না করাকে খারাপ মনে করলে, সেটা ত্যাগ করাও অপরিহার্য। (জামিউত তিরমিযী ২/৯৯, রদ্দুল মুহতার ১/৩৭১)

প্রসঙ্গ : মুসাফির
হাফেজ আনিছুর রহমান
কোতোয়ালি, যশোর।
জিজ্ঞাসা:
স্ত্রী নিজ পিত্রালয় থেকে রুখছত নিয়ে শ্বশুরালয়ে চলে যাওয়ার পর আবার যদি কখনো নিজ পিত্রালয়ে ১৫ দিনের কম থাকার নিয়্যাতে বেড়াতে আসে তাহলে সে মুসাফির হবে, না মুকীম হবে?
সমাধান :
মেয়েদের রুখছতির পর শ্বশুরবাড়িতে স্থায়ী বসবাসের জন্য চলে গেলে পিতার বাড়ি তার জন্য ওতনে আছলী হিসেবে বহাল থাকে না, বিধায় ৪৮ মাইল বা তার বেশি দূরত্বে অবস্থিত নিজ পিত্রালয়ে ১৫ দিনের কম থাকার নিয়্যাতে বেড়াতে এলে সে মুসাফির হিসেবে গণ্য হবে মুকীম হিসেবে নয়। (রদ্দুল মুহতার ২/১৩১, ফাতাওয়ায়ে হাক্কানিয়া ৩/৩৫২)

প্রসঙ্গ : আযান, নামায

মুহা: নূর হোসেন

নোয়াখালী।

জিজ্ঞাসা-ক

আযান ও ইকামাত দেওয়ার সময় বাক্যগুলো কিভাবে দিতে হবে?

সমাধান-ক

আযান দেওয়ার পদ্ধতি হলো الله اكبر দুই নিঃশ্বাস চারবার, اشهد ان لا اله الا الله দুই নিঃশ্বাসে দুইবার, اشهد ان محمدا رسول الله দুই নিঃশ্বাসে দুইবার, حى على الصلوة দুই নিঃশ্বাসে দু'বার, حى على الفلاح দুই নিঃশ্বাসে দুইবার এবং ফজরের আযানে الصلاة خير من النوم দুই নিঃশ্বাসে দুইবার।

আর ইকামাত হবে- الله اكبر الله اكبر এক নিঃশ্বাসে চারবার, اشهد ان لا اله الا الله এক নিঃশ্বাসে দুইবার, اشهد ان محمدا رسول الله এক নিঃশ্বাসে দুইবার, حى على الصلوة এক নিঃশ্বাসে দুইবার, حى على الفلاح এক নিঃশ্বাসে দুইবার, قد قامت الصلوة এক নিঃশ্বাসে দুইবার। এবং الله اكبر الله اكبر এক নিঃশ্বাসে দুইবার لا اله الا الله সহ অর্থাৎ মোট সাত নিঃশ্বাসে ইকামাত হবে। (সুনানু আবী দাউদ ১/৩৩৭)

জিজ্ঞাসা-খ

নামাযে রুকুর আগে ও পরে রফয়ে ইয়াদাইন কেন করা হয়, কোন হাদীসে আছে কি না?

সমাধান-খ

রুকুর আগে ও পরেসহ নামাযের বিভিন্ন স্থানে রফয়ে ইয়াদাইন ইসলামের প্রথমযুগে থাকলেও পরবর্তীতে বিশুদ্ধ হাদীস অনুযায়ী তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্যান্য জায়গার রফয়ে ইয়াদাইন রহিত হয়ে গেছে। (সহীহ মুসলিম ১/১৮১)

জিজ্ঞাসা-গ

ফরয নামাযে প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদের পর দরুদ পড়ার কোনো নিয়ম আছে কি না?

সমাধান-গ

ফরয নামাযে প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদের পর দরুদ শরীফ পড়ার কোনো নিয়ম নেই বরং তাশাহহুদের পর ভুলে দরুদ পড়ার দ্বারা তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়াতে বিলম্ব হওয়ার কারণে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। আর ইচ্ছাকৃত পড়লে নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব। (মুসান্নাফে আবী শাইবা ৩/৪৭)

জিজ্ঞাসা-ঘ

সালাম ফিরায়ে নামায শেষ করা ফরয না ওয়াজিব?

সমাধান-ঘ

সালাম তথা السلام عليكم ورحمة الله বলে নামায শেষ করা ওয়াজিব, ফরয নয়। (জামিউত তিরমিযী ২/৮৯)

প্রসঙ্গ : মুসাফির

মুহা: হুসাইন আহমদ

উত্তরা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা:

আমার জন্মভূমি মেহেরপুর। স্ত্রী ও সন্তানাদি নিয়ে চাকরির সুবাদে ঢাকায় বসবাস করি। ঢাকায় আমার ক্রয়সূত্রে একটি বাড়িও আছে। ঢাকাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করার মানসিকতা আছে। তবে এখনও আমার পৈতৃক সূত্রে কিছু জমিজমা মেহেরপুর আছে। তা ছাড়া সেখানে ভাইয়েরাও থাকেন। এখন আমার জানার বিষয় হলো, আমি যদি মেহেরপুর ১৫ দিনের কম থাকার নিয়্যাতে বেড়াতে যাই তাহলে মুকিমের নামায আদায় করব, নাকি মুসাফিরের নামায পড়ব?

সমাধান :

যেহেতু আপনি স্থায়ীভাবে বসবাসের মানসিকতা নিয়েই ঢাকাতে থাকেন তাই মেহেরপুরে আপনার শুধু জায়গা জমি বা ভাইয়েরা থাকলেও আপনি ১৫ দিনের কমে মেহেরপুর গেলে সেখানে মুসাফির হিসেবেই থাকবেন, মুকিম হবেন না। (আদ্দুররুল মুখতার ২/১৩১, আল হিন্দিয়া ১/১৪২)

প্রসঙ্গ : মশার ব্যাট

মুহা: আব্দুল্লাহ রায়হান

বেলাব, নরসিংদী।

জিজ্ঞাসা:

বৈদ্যুতিক ব্যাট দ্বারা মশা মারা জায়েয আছে কি না?

সমাধান :

অন্য পন্থায় দমন না হলে বৈদ্যুতিক ব্যাট দ্বারা মশা মারার অবকাশ রয়েছে। তবে দীর্ঘ সময় সুইচ চেপে জ্বালিয়ে দেওয়ার অনুমতি নেই। (সুনানে আবী দাউদ ২/৩৬৩)

প্রসঙ্গ : ঔরস

মুফতী হেলালুদ্দীন

বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

জিজ্ঞাসা :

এক ব্যক্তির স্ত্রী গর্ভবতী। তাদের বিবাহ বন্ধনের বয়স তিন মাস। আল্ট্রাসনোগ্রাফি করানোর মাধ্যমে দেখা গেল যে গর্ভের বাচ্চার বয়স পাঁচ মাস। এখন প্রশ্ন হলো, এমতাবস্থায় স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি কোনো ধরনের সন্দেহ করতে পারবে কি না?

সমাধান :

আল্ট্রাসনোগ্রাফি শরীয়তের কোনো দলিল নয়। বিধায় এর ভিত্তিতে স্ত্রীকে সন্দেহ করা যাবে না। শরীয়তের দৃষ্টিতে গর্ভের সর্বনিম্ন সময়সীমা হচ্ছে ছয় মাস। সুতরাং বিবাহের ছয় মাস পর বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হলে তা পিতার বৈধ সন্তান হিসেবে গণ্য হবে। ছয় মাসের আগে বাচ্চা হলে তা অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। এ ক্ষেত্রে সন্দেহের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার অবকাশ নেই। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৫৩৬, রদ্দুল মুহতার ৩/৪৯)

মলফূজাতে আকাবের

আবু নাঈম মুফতী মুঈনুদ্দীন

যিকিরের ফায়দা :

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা যতটুকু যিকির ফিকিরের তাওফীক দান করেন, করতে থাকো। সাহস হারাবে না, যদিও অন্তরে কোনো ক্রিয়া না করে। যবানে যিকির করতে পারা কি অল্প ফায়দার কাজ? যবান যখন যিকিরের কারণে জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে যাবে, অন্তরও বেঁচে যাবে। (তালীফাতে রশীদিয়্যাহ)

আল্লাহর ওলী কে?

আল্লামা আবুল কাসেম কুশাইরী (রহ.) বলেন, আল্লাহর ওলী সেই ব্যক্তি, যিনি সততার সাথে আল্লাহ পাকের হক আদায় করেন এবং মানুষ তাঁর থেকে দু'আর আবেদন করার অপেক্ষা না করে তাঁদের জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে দু'আ করতে থাকেন। এবং কারো থেকে প্রতিশোধ নেন না ও মাখলুক থেকে কিছু পাওয়ার আশা রাখেন না। নিজের স্বার্থে কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করেন না। (রুহকী বীমারিয়াঁ আওর উনকা এলাজ ১৬৪)

আল্লাহকেই সন্তুষ্ট রাখুন :

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, সত্যান্বেষণকারীর নিকট কারো অসন্তুষ্টির কোনো পরোয়া নেই। নিজের পক্ষ থেকে কাউকে দুশমন বানাবে না। তার পরও যদি কেউ অসন্তুষ্ট হয়, হোক। আল্লাহ আপনার সহায় হবেন। আল্লাহর ওপরই পূর্ণ ভরসা রাখা এবং তাঁকেই সন্তুষ্ট রাখা উচিত। বরং অনেক সময় অন্যের অসন্তুষ্টি অনেক বিপদাপদ থেকেও মুক্তির কারণ হয়। (কামালাতে আশরাফিয়্যাহ)

অমূল্য বাণী :

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) বলেন,

(ক) গুনাহগারকে আমার এত ঘৃণা লাগে না, যত বেশি ঘৃণা লাগে সেই ব্যক্তিকে, যে নিজকে পবিত্র আত্মার অধিকারী মনে করে।

(খ) ভুল করে তা সঠিক প্রকাশ করার চেষ্টা করা অত্যন্ত খারাপ কাজ। ওজরের সাথে মাফ চেয়ে নিলে কোনো অসুবিধা তো নেই।

(গ) দুটি জিনিস আলেমদের জন্য খুবই মন্দ– ১. লোভ-লালসা। ২. অহংকার। এ দুটি তাঁদের মধ্যে না থাকা উচিত।

(ঘ) অস্বেচ্ছামূলক কাজের পেছনে পড়বে না এবং স্বেচ্ছামূলক কাজে অলসতা করবে না–এটা সলূকের অর্ধাংশ।

(ঙ) সমস্ত আমলের মূল এই যে, নফসকে জানোয়ারের মতো আযাদ ছেড়ে দেবে না। বরং তাকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখবে। একেই ধৈর্য বলা হয়।

(চ) প্রশান্তি অর্জনের উত্তম ও সহজ পদ্ধতি হলো, নিজের সকল কাজকে আল্লাহ তা'আলার ওপর সোপর্দ করে দেওয়া। (মাজালিসে মুফতীয়ে আ'জম)

অধিক কথনের প্রতিকার :

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, জিহ্বাকে একটু ছাড় দিলেই তা গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। তার একটি ব্যবস্থা, যা একই সঙ্গে প্রতিকারও বটে তা এই যে, যখন দু-চার ব্যক্তি একত্র হয়ে কথা বলবে, তখন কথাবার্তা শেষ করার পূর্বে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের কিছু যিকিরও করবে। এর প্রয়োজনীয়তা হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। ইরশাদ হয়েছে, যে মজলিসে মানুষ কথা বলে অথচ আল্লাহ তা'আলার যিকির করে না এবং নবী করীম (সা.)-এর ওপর দরুদ পাঠ করে না, সে মজলিস কিয়ামতের দিন তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে। আর কিছু না হলেও শুধু এতটুকু বলবে–

سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ

এটা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের যিকিরের সমন্বিত শব্দ। উলামায়ে কেরাম এ কথাও লিখেছেন যে এতে মজলিসের কাফফারা হয়ে যায়। (কামালাতে আশরাফিয়্যাহ মলফুয নং ১১৬৮)

নীতি-চরিত্রের সারকথা :

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, হাদীসের ভাণ্ডার অনুসন্ধান করলে জানা যায় শিষ্টাচারের সারকথা এই যে, একজনের দ্বারা অন্যজনের যেন কষ্ট না হয়। (প্রাগুক্ত মলফুয নং ১৩০)

AL MARWAH OVERSEAS
recruting agent licence no-rl156

ROYAL AIR SERVICE SYSTEM
hajj, umrah, IATA approved travel agent

হজ, ওমরাসহ বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং ও সকল এয়ারলাইন্স টিকেটিং অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে অল্পখরচে দ্রুত সম্পন্ন করা হয়।

Shama Complex (6th Floor)
66/A Naya Paltan, V.I.P Road
(Opposite of Paltan Thana East Side of City Haeart Market)
Dhaka: 1000, Bangladesh.
Phone: 9361777, 9333654, 8350814
Fax 88-02-9338465
Cell: 01711-520547
E-mail: rass@dhaka.net

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সর্বপ্রকার বাতিলের মোকাবেলায় এগিয়ে যাবে
"আল-আবরার" এই কামনায়

জনপ্রিয় ১৯৩৭ সাবান

প্রস্তুতকারক

হাজী নুরআলী সওদাগর এন্ড সন্স লিঃ
চাক্তাই, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
ফোন : বিক্রয় কেন্দ্র : -০৩১-৬৩৪৯০৫, অফিস: ০৩১-৬৩২৪৯৩, ৬৩৪৭৮৩